শঙ্খ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা

শঙ্খ ঘোষের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

দে'জ পাবলিশিং

SHRESTHA KAVITA
A selection of poems by
SANKHA GHOSH
Published by Sudhangshu Shekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 125.00

ISBN 81-7079-334-3

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭০
পরিবর্ধিত দে'জ প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৮৫। জুলাই ১৯৭৮
পরিবর্ধিত দে'জ সপ্তম সংস্করণ : পৌষ ১৪০৩। ডিসেম্বর ১৯৯৬
পরিবর্ধিত দে'জ অষ্টম সংস্করণ : ভাদ্র ১৪০৬। সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
পরিবর্ধিত দে'জ দশম সংস্করণ : ভাদ্র ১৪১১। সেপ্টেম্বর ২০০৪
পরিবর্ধিত দে'জ দ্বাদশ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৫। মে ২০০৮

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

১২৫ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

অল্পবয়সে বুদ্ধদেবের একটি লাইন নিয়ে আমরা কৌতুক করেছি খুব। মাত্র চল্লিশেই কেন উনি বিলাপ করবেন 'আমি বুড়ো, প্রায় বুড়ো, কী আছে আমার আর তীব্র তেতো মত্ত স্মৃতি ছাড়া'? এই ছিল হাসাহাসির বিষয়। কিন্তু এখন, ওই বয়সে পৌঁছবার আর সামান্যই যখন বাকি, এখন যেন টের পাওয়া যায় শব্দগুলির ভিতরকার লাঞ্ছনা। কৌতুকটা বুঝি ফিরিয়ে নিতে হলো আজ।

আরো তা ফিরিয়ে নিতে হলো গোপীমোহনবাবুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ডাক শুনে। সহৃদয় তাঁর আহ্বান, সাহসিক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা? শুনে মনে হয় যেন পরীক্ষাঘরের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল। এই কি আমাদের অবসান তবে? আমরা তো ভাবছিলাম আরো অনেক বাকি আছে এগিয়ে-পিছিয়ে খেলা, অনেক নতুন করে শুরু কিংবা নতুন করে ছাড়া। তাহলে তা নয়?

সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার। কিন্তু জীবিকাবশে শ্রেণীবশে এতই আমরা মিথ্যায় জড়িয়ে আছি দিনরাত যে একটি কবিতার জন্যেও কখনো-কখনো অনেকদিন থেমে থাকতে হয়। উপরন্তু আমি যে আধুনিকতার কথা ভাবি সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোনো মানে নেই, অবাধ প্রগল্‌ভতার কোনো প্রশ্রয় নেই। তাই কম লিখি বলে আমার ভয় হয় না। আমার ভয় কেবল এই যে সমস্তটা মিলিয়ে আদ্যন্ত একটিই-যে নাটক গড়ে উঠবার কথা ছিল, আজও তার অবয়ব দেখতে পাই না স্পষ্ট। 'বলা হয় না কিছু' : এখনও রয়ে গেল পুরোনো সেই নিষ্ফলতার বোধ। এ সংকলনের সবচেয়ে প্রাচীন লেখা "কবর", সবচেয়ে নতুন "ভূমধ্যসাগর" ; মধ্যবর্তী ঠিক কুড়ি বছরের সময় থেকে সাজিয়ে নিতে গিয়ে দেখি, হতাশা ছাড়া হাতে থাকে না কিছুই।

তাই, শ্রেষ্ঠ কবিতা বলার কোনো মানে নেই একে।

চৈত্র ১৩৭৬ শঙ্খ ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণ

'শিকড়ের ডানা' শিরোনামে যে অনুবাদ-কবিতাগুলি ছিল পুরোনো সংস্করণে, এবার তা সরিয়ে নেওয়া হলো বই থেকে। পরিবর্তে দেওয়া হলো 'আদিম লতাগুল্মময়', 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' আর 'বাবরের প্রার্থনা' থেকে নির্বাচিত কিছু লেখা, আগে যা ছিল না এখানে।

পৃষ্ঠাসূচনার লাইন ডানদিকে একটু সরানো থাকলে বুঝতে হবে, সেখান থেকে শুরু হচ্ছে নূতন স্তবক। আষাঢ় ১৩৮৫

সপ্তম সংস্করণ

'লাইনেই ছিলাম বাবা' আর 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' থেকে কয়েকটি কবিতা জুড়ে, পুরোনো সংস্করণের কয়েকটি বর্জন করে, ছাপা হলো এই সংস্করণ।

আগের মতোই, শব্দের আদিতে অ্যা-ধ্বনি বোঝাবার জন্যে ে চিহ্ন ব্যবহার করা হলো। পৌষ ১৪০২

নবম সংস্করণ

প্রায় তিরিশ বছর আগে প্রথম বেরিয়েছিল এই বই। পরে, আরো আটবার ছাপা হলো দে'জ প্রকাশনী থেকে। এবারকার মুদ্রণে দুটো নতুন বই থেকেও কবিতা রাখতে হলো বলে বর্জিত হলো পুরোনো কয়েকটি লেখা। একটু একটু করে অনেকটাই পালটে গেল বই। ভাদ্র ১৪০৬

একাদশ সংস্করণ

আবারও কিছু বদল হলো। 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' থেকে একটি আর 'জলই পাষাণ হয়ে আছে' বইটির কয়েকটি কবিতা যুক্ত হলো এই সংস্করণে। ভাদ্র ১৪১১

দ্বাদশ সংস্করণ

'সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি' বইটি থেকে কয়েকটি কবিতা নিয়ে এই সংস্করণ তৈরি হলো। বর্জিত হলো "আদিপুরাণ" নামের কবিতাটি। বৈশাখ ১৪১৫

শঙ্খ ঘোষ

দিনগুলি রাতগুলি

[ইভাকে]

৭ জানুয়ারি। রাত্রি

হে আমার সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো।
ঐ তার আলুলায়িত বেদনার কালো, তারই চুপে দীর্ঘকাল এ আমার স্নান,
বদ্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা–
কী লাভ কী লাভ তাকে অবিশ্রাম ক্লীবত্বের জ্বালাময় দৈন্যে পুঞ্জ ক'রে?
কিংবা তাকে মহত্ত্বের শিখরে ছুটিয়ে নিয়ে অবশেষে নির্বাধ প্রপাতে
অন্তহীন অন্তহীন অন্ধকারে বিসর্জন ক'রে
কী লাভ কী লাভ?

তাই
এমন আকাশ হবে তোমার চোখের মতো ভাষাহীন নির্বাক পাথর, দৃষ্টি তার স্থির
হবে মৃতের প্রাণের মতো উদাসীন নির্মম শীতল, তুমি আছো সর্বময় রাত্রির গহনে
মিশে– আমি এক ক্লান্তির কফিনে, তুমি যদি মৃত্যু আনো অবসাদে মূক আর কঠিন
কুটিল রাত্রি জুড়ে–
হে আমার তমস্বিনী মর্মরিত রাত্রিময় মালা,
মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা,
আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে দুপুরে বিকেলে
এবং আমাকে বলো, 'মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন' :
আমি হব তাই
তৃণময় শান্তি হব আমি।

৮ জানুয়ারি। সকাল

ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না। আবার প্রভাত হলে পৃথিবী
উন্মুখ হবে, রৌদ্র হবে ব্যাধের মতন। আমাকে হানবে তারা বড়ো!
তার চেয়ে তমস্বিনী রাত্রি ভালো আজ, তামসীরে মেরো না মেরো না–
ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না।

৮ জানুয়ারি। দুপুর।

হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।
আকাশ, প্রসন্ন হও। রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগঞ্চল– দীর্ঘ

করো তামসগুণ্ঠন। আমাকে আবৃত করো ছায়াস্তৃত একখানি ধূসর-বাতাস-
ঢালা অকরুণ আলোর মালায়,
আমাকে গোপন করো তুমি।

৮ জানুয়ারি। রাত্রি

আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়, প্রেমের বিষাণে তারা ছুটে ছুটে মাথা কুটে মরে, ভয়ে কাঁপে দূর-দূরান্তর।
কত বলি, কত ভালোবেসে মৃদু স্বরে-সুরে বলি তাকে, রে দুরন্ত চোখ, স্পর্শ তাকে কোরো না কোরো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃন্তে অন্তহীন সে পেয়েছে শুধু একখানি
অবসন্ন দীন ছায়ামাখা ভারি কৃপণ আকাশ
সেই তার ভালো।
কত বলি, শোনো তুমি অবকাশহারা গূঢ় ব্যথায় আরক্ত-চিত্ত, শোনো। লজ্জার আনীল বিষে মুখ তুমি ঢেকো না ঢেকো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃন্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু
যন্ত্রণার ডালা।
সেই তার ভালো।

৯ জানুয়ারি। সকাল

'এখানে ঘুমায় এক মানবহৃদয়, তার জলে লেখা নাম।'

কবিদেব, কেবল বেদনা– আহা কেবল বেদনা বুঝি ভালোবাসে তোমার হৃদয়! মাটির শীতল স্পর্শে অবিরাম অবিরাম কবর কামনা করো তাই? কতদিন মুঠো মুঠো এমন প্রভাত তুমি ধরেছ কিশোর? কতদিন সূর্য থেকে মাটি থেকে শূন্য থেকে ধরেছ আকুল মনোভারে
একখানি শিথিল প্রণয়?
অবশেষে একদিন জলে-লেখা-নাম কবি মাটির বাসরে ঘুম রচে।

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না
বেদনার শাদা ফুলে আকাশ নিবিড় হবে, অবকাশে ভরে যাবে প্রাণ। অবশ বিরামভরা এ পদচারণা তার পুঞ্জ হবে ভাষার আলোকে। আকুঞ্চিত দুটি হাতে আঙুলে আঙুলে তুমি টেনে নেবে গান–
অবশেষে থরে থরে কথার কাকলি তুলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী, উচ্চকিত পৃথিবীর দুর্বার প্রতাপ তুচ্ছ ক'রে, কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষ-ধন্য

মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী
রাত্রির আবেশে মগ্ন হবে–
তবু সে প্রেমের রাত্রি তার!

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না।

১১ জানুয়ারি। দুপুর
সুন্দর কবিতা সখী!
যখন বিষণ্ণ তাপে প্রধূম গোধূলি তার করুণাবসন ফেলে সূর্যমুখী পৃথিবীকে ঢাকে, কঠিন বিলাপে কাঁপে উপশিরা-শিরা, জ্যোতিষ্কলোকের রূপসীরা একে একে ছিন্ন করে দয়িত-আকাশ, যখন প্রেমের সত্য ভুবনে ভুবনে ফেরে করুণ লেখায়, তুমিও আসন্ন চন্দ্রে মেলে দাও হৃদয় তোমার, আমি থরোথরো শীতে যন্ত্রণার শিখা মেলি আতপ-তির্যক, যখন পৃথিবী কাঁপে মৃততেজা মুঠোতে আমার–

তখন কবিতা মিতা, প্রিয় থেকে প্রিয় সখী, সুহৃদ, সুন্দর!

জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারই বিকাশ।
মেঘের গুহায় ঢালি হৃদয় যখন, দেখি তোমারই বিকাশ।
কুয়াশা-উথাল জটা দিক দিক ভরে যদি, তোমারই বিকাশ।
স্মরণ যেখানে, প্রাণ যেখানেই, সেখানেই তোমার বিকাশ।

তখন কবিতা মিতা প্রিয় থেকে প্রিয় সখী সুহৃদ সুন্দর!

কবি রে, তোর শূন্য হাতে
আকাশ হবে পূর্ণ–
উদাস পাগল গভীর সুরে
ডাক দে তারে ডাক দে!
ভাঙতে কাঁকন, ছিঁড়তে বাঁধন
কুলোয় না তার সাধ্যে
কবি রে, আজ প্রেমের মালায়
ঢেকে নে তোর দৈন্য!

বহো রে আলোর মালা অবশা রাত্রি ঘিরে
মেঘের ওই আকাশ ছিঁড়ে ঝরে রে বেদন-সুরা
কবিতা কল্পলতা আকুলা চঞ্চলতা
বাঁধে রে যন্ত্রণা তার বাঁধে সে তমস্বিনী।।
বহো রে আলোর মালা গগনে দাও ছড়িয়ে
দহনে দগ্ধ ক'রে হৃদয়ে ঝিলিক করো–
মেঘে কে জাগছ তুমি জাগো কে শূন্যপুরে?
কবিতা সূর্যলতা হৃদয়ে চক্ষে জ্বলে।।
বহো রে আলোর মালা তামসী কণ্ঠ জুড়ে–
তবু কে কাঁদছে সুরে? কবি কি নিত্য কাঁদে?
কবি সে, নিত্য কাঁদে আকাশে নিত্য বেদন :
বহো রে আলোর মালা ছেঁড়ো রে কালোর বাঁধন।।

১২ জানুয়ারি। রাত্রি

বাসনা-বিদ্যুতে তুমি ছিন্ন করো চরিত্রের মেঘ। প্রভূত-আবেগ-পুঞ্জ চেতনার বৃষ্টি করো আলুথালু প্রকৃতির মুখে। রজনী শাঙন-ঘন, জীবন ময়ূর, দুঃখ কাঁপে দুর্বল দারুণ।

প্রেমের বিকীর্ণ শাখা ফুলে-ফলে জ্বলে। জেগে ওঠে ধীরে ধীরে একখানি তপ্তহত পরিপূর্ণ মুখ। রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।

বাউল

বলেছিলাম, তোমায় নিয়ে যাব অন্য দূরের দেশে
সেই কথাটা ভাবি,
জীবনের ওই সাতটা মায়া দূরে দূরে দৌড়ে বেড়ায়
সেই কথাটা ভাবি।
তাকিয়ে থাকে পৃথিবীটা, তোমার কাছে হার মেনে সে
বাঁচবে কেমন ক'রে।
যেখানে যাও অতৃপ্তি আর তৃপ্তি দুটো জোড়ায় জোড়ায়
সদরে-অন্দরে।

উদাসিনী নও কিছুতে– বুঝতে পারি তোমার বুকে
অন্য কিছু আছে,
যন্ত্রণা তার পাকে পাকে হৃদয় খোলে, সে-খোলাটার
অন্য মানে আছে।
ঘুমের মধ্যে দেখি আলোর ভরা-কুসুম নীলাংশুকে
বাঁধতে পারে না এ :
উঠেই দেখি কী বিচিত্র, একটি আঁচড় লাগেনি তার
ভালোবাসার গায়ে।

বলেছিলাম তোমায় আমি ছড়িয়ে দেব দূর হাওয়াতে
সেই কথাটা ভাবি।
তোমার বুকের অন্ধকারে সুখ বেজেছে মদির হাতে
সেই কথাটা ভাবি।

কবর

আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে–
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন–
নীচে কি তার একটুও নয় ভিজে?
ছড়িয়ে দেব দু-হাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,
যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে।

ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা
তোমার কোনো কাজেই লাগে নি তা–
পথের কোণে ভরসাহারা পড়ে ছিলাম সারাটা দিন :
আজ আমাকে গ্রহণ করো মিতা।
আর কিছু নয়, তোমার সূর্য আলো তোমার তোমারই থাক
আমায় শুধু একটু কবর দিয়ো
চাই না আমি সবুজ ঘাসের ভরা নিবিড় ঢাকনাটুকু
মরাঘাসেই মিলুক উত্তরীয়।

লজ্জা ব্যথা অপমানে উপেক্ষাতে ভরা আকাশ
ভেঙেছে কোন্ জীবনপাত্রখানি–
এ যদি হয় দুঃখ আমার, তোমায় নয় তো এ অভিযোগ
মর্মে আমার দীর্ঘ বোঝা টানি।
সেদিন গেছে যখন আমি বোবা চোখে চেয়েছিলাম
সীমাহীন ওই নির্মমতার দিকে–
অভিশাপ যে নয় এ বরং নির্মমতাই আশীর্বাদ
হে বসুধা, আজ তা শেখে নি কে।

রক্তভরা বীভৎসতায় ভরেছে তার শীর্ণ মাটি
রিক্ত শুধু আমাদের এই গা-টা
টানাটানা চক্ষু ছিঁড়ে উপচে পড়ে শুকনো কাঁদা
থামল না আর মরুবালুর হাঁটা!
যে পথ দিয়ে সূর্য গেল ছায়াপথও তার পেছনে
হারিয়ে যায় লুকিয়ে যায় মিশে
ঘোড়ার ক্ষুরে থিঁতাল বুক অলজ্জ-সে আলোর ধারা
দীপ্ত দাহ ভরেছে চোখ কিসে!

কুণ্ডলিত রাত্রিটা আজ যাবার সময় বলল আমায়
'তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে,
ঋজু কঠিন সব পৃথিবী হাড়ে-হাড়ের ঘষা লেগে
অক্ষমতা তোমার চোখের পলে।'
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা–
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।

ঘরেবাইরে

এই সেই অনেকদিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে।
যেদিকে তাকাই তার নির্বোধ নীরব চোখ,
ভীষণ লজ্জাহীন একঘেয়ে সূর্যহীন গন্ধ
বৎসরের পর বৎসর একখানি করে টালি খসিয়ে মাথা তুলছে।
বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলির মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ্য দুরবলোক্য তর্জনী
তাকিয়ে মনে হয়
আশা নেই আশা নেই
আমার বয়স হাজার কিংবা এ-রকম
আর সামনের ভবিষ্যৎ মানেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধ বর্বর যুগ
যে মারে সেই বাঁচে–
অন্তত মা-র মুখে তাকিয়ে এ-ছাড়া আর কোন্ আশা?

আমি জানি মায়ের এই দম্ভ ঘুচবে না কোনোদিন
অকুলানের সংসারকে কুলিয়ে দেবার দম্ভ–
এ দুঃসাহসিক স্পর্ধা তার ভঙ্গুর পদক্ষেপেও কী আশ্চর্য প্রখর ফোটে।
কিন্তু তবু
তবু তার আঙুলের পঞ্চমুদ্রার বঙ্কিম ভঙ্গিতে বিধাতা ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ
আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সেই আদিম হা-কপাল শিরশির করে ওঠে
'আর পারি না
তোমরা বরং এই দুর্দম ভার গ্রহণ করো, আমি দেখি
কী আলাদিনের প্রদীপে খরচ কুলোয় রাবণের।
আর, ভগবান,
সংসারের কোন্ সাধটা-বা মিটল এই অফুরান ঘানি টেনে টেনে!'

এমন ললিত সন্ধ্যা সোনার পঞ্চপ্রদীপ ছোঁয়াবে শান্ত ছেলের মাথায়
(হায়রে শান্তি)
ধানের শিয়রে পায়রা
(হায়রে শান্তি)
প্রজাপুঞ্জ বাইরে বেরোয় ঘর ছেড়ে কোন্‌খানে একটু নিশ্বাস মিলবে
শূন্য নীলে কিংবা শহরে
যেখানে ঘর নেই, ঘরের নৈরাশ্য নেই, ঠাকুমার চোখ নেই।

তারপর
সারাদিনের ক্লান্তি মিশে মিশে
সেই অস্বচ্ছ দিনান্তে ভয় নেমে ভীষণ
বাহির কৈল ঘর।

আর দেখব না সেই লাঞ্ছিত চোখ।
যার এক চোখ হাওয়ায় পশুগ্রাস দেখে দেখে ভয়ে স্থির,
ধর্ষকাম পৃথিবীর হাত থেকে, শূন্যবন্ধন থেকে
কেঁপে কেঁপে পেছোতে চায়, দেয়ালে লেগে লেগে রক্তের মতো নিশ্বাস টলছে–
আরেক চোখে ভীষণ নির্লিপ্ত ক্ষমা নীরব থেকে থেকে
লজ্জাতুর করে তুলছে যৌবন।
পসারিনী, যৌবন নিলাম করে ঘাটে ঘাটে
এমন নিষ্ঠুর ক্ষমায় বিঁধো না আমায় যৌবনবতী–

এই অজস্র বলি (মাগো!)
বালির নীচে নীচে কবর কামনা করে,
কতদূর থেকে তৃষ্ণা এসে এসে সমুদ্র ছুঁতে পায় না :
আর মায়ের যন্ত্রণা!

এ কোন সৃষ্টির যন্ত্রণা!

সপ্তর্ষি

'Strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto Life : and few there be that find it.'– New Testament.

আমি প্রায়ই ভাবি, মেঘলা-টোপর সন্ধ্যাকে ভালোবাসব প্রিয়ার মতো
হাত বাড়িয়ে ডাকব তাকে এসো এসো। এসো
প্রাত্যহিকের দিনযাপনকে জীবন করে ভরিয়ে দাও–
আমি প্রায়ই ভাবি।

সাত ঋষি নিত্য জাগে আকাশে প্রশ্নচিহ্ন তুলে
অন্ধকারের অনিবার্য সূচিভেদ্য আক্রমণ বেদনার ঢেউ তোলে বুকের উপান্তে,
কঠিন আবিলতায় আচ্ছন্ন নীরক্ত কৃষ্ণ চক্ষু
অগণ্য বুদবুদের রাশীকৃত অনিশ্চয়তার মধ্যে
মুহুর্মুহু সে-প্রশ্নের উত্তর জোগাবার ভান করে!

ইতিহাস স্থির এবং কঠিন
এবং অকম্পিত কৃপাণশোভিত বজ্রহাত দৃঢ় থেকে দৃঢ়
ক্ষমা জোগায় না তার নির্দেশে।
তিথিতে আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত ঘোষণালিপির শমন পৌঁছয়
দ্বারে দ্বারে–
অকৃপণ তার কণ্ঠ :
প্রত্যুষের পাখিকূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে
শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন
ইতিহাসের কুঠারে ঈশ্বরের টুকরো-টুকরো-খণ্ড অভিশাপ বর্ষণ করে তার মাথায়,
মৃত্যুর শোচনীয় গহ্বরে মুহূর্তে তলিয়ে যায় তারা ;
এবং আর এক মহান মৃত্যু দুর্গম নিশ্চিতের লালপথে আহ্বান জানায় সকলকে।

মহতো মহীয়ান দেদীপ্য আশা আমার সামনে,
সপ্তর্ষির প্রশ্ন কোটি হৃদয়ে আবেগবন্ধুর জিজ্ঞাসার অনুরণন তোলে
সতত তরুণ যাত্রা
বিদ্রোহী নবকেতন কুয়াশালীন পথের প্রস্তুতি স্থির করে
আর ঘোষণা করে–
'জীবনের দ্বার সংকীর্ণ এবং পথ দুর্গম
অল্প লোকেই তা পায়' :
কেননা আমরা সেই কতিপয়ের অন্যতম।

মেঘ থেকে ছিন্ন বৃষ্টিতে আমরা সিক্ত
এবং আমাদের ডেরায় পানীয়ের সন্ধান নেই কোনো–
মৃত্যু যদিও তোমায় স্তূপ স্তূপ জমায়
বৃষ্টি তাকে বন্যা করে কঠিন ছল ভাঙছে।

বলো তারে 'শান্তি শান্তি'

১

মাগো, আমার মা–
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

এই যে ভালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ,
এই যে স্নেহের সুরে-আলোয় বাতাস আমায় ঘর দিল রে দিল–
আকাশ দুটি কাঁকন বাঁধে, বলে, আমার সন্ধ্যা আমার ভোর
সোনায় বাঁধা– ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যু-মনোরথ।
সেই কথা এই গাছ বলেছে, সেই কথা এই জলের বুকে ছিল,
সেই কথা এই তৃণের ঠোঁটে– ভুলে যা তুই, দুঃখরে ভোল তোর,
ধুলোতে তুই লগ্ন হলে আনন্দে এই শূন্য খোলে জট!

তুমি, আমার মা–
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, দুঃখ তোমার পল্লবে কি গাঁথা?
তুমি আমার চক্ষু ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

২

আকাশ বলে বাতাস বলে ব্যথা।
ব্যথার তুলি পলাশলাল মেঘে।
ভাঙলে তুমি প্রেমের নীরবতা
দুঃখ আমার টলবে বুকে লেগে।

দুঃখ আমার বুকের টলোমলো
জলের বুকে সন্ধ্যা দিল এঁকে–
ব্যথায় লেগে বন-বনানী হলো
আমার মতো, আমার মতো কে কে?

আমার মতো বাতাস জানে ডানা,
আমার মতো সূর্য জানে ফুল,
তোমার চোখে নিদ্রা হলো টানা
মরণমুখী সূর্য আর জাগনলোভী চাঁদে
আকাশ পরে স্নিগ্ধ দুটি দুল!

৩

মাগো, আমার মা–
তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, রাত্রি এল অস্তদিঘির পার,
যেখানে এই চোখ মেলেছ সেইখানে কার শান্তি কেঁদে মরে?
নিশুতি রাত ঝুমঝুমিয়ে আর্তনাদের বর্শা এল ছুটে–
যেখানে যাও সেখানে নেই শান্তি তোমার সেখানে নেই আর!
দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে
যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে–
আকাশ-ডাঙা বন-বনানী শান্তি বাঁধে শান্তি বাঁধে কার!

তুমি, আমার মা–
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, রক্তে ঘটের সিঁদুর হবে টানা,
তুমি আমার ঘর ছেড়ে মা কোথাও যেয়ো না।

৪

বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন?
নীলদুয়ারে ঘা দিল ভাই মেঘের সেনাগুলো।
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন?
ভয়ের দুয়ার-বন্ধ ঘর কাঁপছে জড়োসড়ো–
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে বড়ো!

মাগো, আমার মা–
ঝড় নেমেছে, দুয়ারে তার ঝাপ্টা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
বাজনা বাজুক, ভয় পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা!

যমুনাবতী

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death.– Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে!
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু-এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।

হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

নিভন্ত এই চুল্লি তবে
একটু আগুন দে–
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে!
দু-পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দি
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি'।

বর্গি না টর্গি না, যমকে কে সামলায়।
ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়?
যাসনে ও-হামলায়, যাসনে॥

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না–
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না–

চলল মেয়ে রণে চলল!
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝনঝন করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল!
পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল!

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা–
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক ধক, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি!

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে!

সূর্যমুখী

ইচ্ছে হলো ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর
'এ যে বিষম! এ যে কঠিন!'
কী যে ছোট্ট বাড়ি–
সকালও তার মুখ দেখে না, বিকেল করে আড়ি।

পীতল মুখে শূন্যে ঝোলে সূর্য সারা দুপুর
ঘরেতে তার তাপ পৌঁছয়, জ্বর হয়েছে খুকুর।
শুকনো ভাঙা বেদানা তার মাথার কাছে খোলা,
ছোট্ট দুটো হাত ভরে দেয় বুকে কঠিন দোলা,
লালছলোছল আলগা চোখে তাকাল ভয়-ভয়,
যে-দেয়ালেই চোখ পড়ে তার সে-দেয়ালেই ক্ষয় :
হঠাৎ জোরে কেঁপে উঠল, আলো দেখব মাগো–

এ কী বিপুল সহ্য সখী! জাগো কঠিন জাগো!

বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন ভারি
সকালও যার মুখ দেখে না বিকেল করে আড়ি?

অন্যরাত

মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ধুলোর মতো ছোটে
যে কথাটা বলব সেটা কাঁপতে থাকে ঠোঁটে,
বলা হয় না কিছু–
আকাশ যেন নামতে থাকে নিচুর থেকে নিচু
মুখ ঢেকে দেয় মুখ ঢেকে দেয়, বলা হয় না কিছু।

মুখ ঢেকে দেয় আড়াল থেকে দেখি পক্ষ্মপুটে
জলে জমল বেদনা আর কেঁপে দাঁড়ায় উঠে
নানারঙের দিন–
সোনার সরু তারে বাজনা বাজে রে রিনরিন
বেদনা তার জাগায় মধু-হাওয়ায় ভরা দিন।

মস্ত বড়ো অন্ধকারে স্বপ্ন দিল ডুব–
বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন খুব?
মিলাল সংশয়–
শাদা ডানায় জল ভরে কে তুলল বরাভয়
কঠিন নয় কঠিন নয় বাঁচা কঠিন নয়।

পথ

পথের বিলাস যায় পথে পথে বিলাতে বিলাতে–
উদ্‌বৃত্ত থাকে না কিছু– এ বড়ো আশ্চর্য লাগে সখী।
যত ছন্দ বাজে, যত তৃপ্তি দেখো স্ফটিকে নীলাতে
তাতে খুঁজে দেখো, প্রশ্ন করে দেখো, 'আছো কি আছো কি'–
থাকে না সে কিছুতেই, মেলে না যা কিছুতে মেলে না,
ঘরে যাকে পেতে চাও সে পালায় পথে পথে ঘুরে।
স্ফটিকে নীলায় যাকে পাও, প্রাণভরণের দেনা
তাতেও মেটে না তাই ছুটে চলি আরো আরো দূরে।

এ কেমন মন্দ নয় তবুও পথেই বাসা ভরা–
দৃষ্টিতে মেলেনি যাকে সৃষ্টি ভরে তাই অনুভব।
মন্দ নয় গিয়ে বসা জমায়েতে, নির্দয়-অক্ষরা
প্রকৃতির কথা শোনা, দূরাদয়শ্চক্রনিভ সব
গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া মরীচিকাবৎ চোখে চোখে,
ফুল ছোঁড়া রং ছোঁড়া প্রাণহীন স্থবির ভিলাতে।
যে বিলাস অন্তহীন ধুলাগত পলাশে অশোকে
পথের সে প্রেম যাক পথে পথে বিলাতে বিলাতে।

আড়ালে

দুপুরে-রুক্ষ গাছের পাতার
কোমলতাগুলি হারালে–
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

যখন যা চাই তখুনি তা চাই।
তা যদি না হবে তাহলে বাঁচাই
মিথ্যে, আমার সকল আশায়
নিয়মেরা যদি নিয়ম শাসায়

দগ্ধ হাওয়ার কৃপণ আঙুলে–
তাহলে শুকনো জীবনের মূলে
বিশ্বাস নেই, সে জীবনে ছাই!

মেঘের কোমল করুণ দুপুর
সূর্যে আঙুল বাড়ালে–
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

কলহপর

যত তুমি বকোঝকো মেরেকুটে করো কুচিকুচি–
আমি কিন্তু তবু বলব এসবেই আন্তরিক রুচি :
ঘরে থাকতে অল্প মতি, রোদে রোদে পথে ঘুরে ফেরা,
আকাশে বিচিত্র মেঘ নানা ছন্দে তোলে যে অপেরা
তাতে লুপ্ত হতে হতে রুক্ষ চুলে বাড়ি ফিরে আসা
পোড়া-মুখে চিহ্ন তার অকুণ্ঠ বিস্মিত ভালোবাসা!
ক্ষিদেয় তৃষ্ণায় টলে কণ্ঠাবধি সমস্ত শরীর,
অভ্যাস মরে না জেনে দুই চোখে তুমি তোলো তীর
তা সত্ত্বেও বিনাম্লানে ভালো লাগে মধ্যাহ্নভোজন।

স্বাস্থ্যকে তা ক্ষুণ্ণ করে, দিনে দিনে কমায় ওজন,
ভদ্রতা বিপন্ন হয়– নানাজনে করে কানাকানি,
এ সবই যে দুঃখপ্রদ, সন্দেহ কী, অবশ্য তা মানি।
কিন্তু তবু নিরুপায়। স্বভাবে যে পৃথিবীর মুঠি
তাকে আলগা করা তার সাধ্য নয়– প্রকাণ্ড ভ্রূকুটি
প্রকাণ্ড দুর্বৃত্ত দিন মুষড়ে পড়ে যে-আমার পায়ে
সে যে মরে ছুটে ছুটে মগ্ন হয়ে বিবিধ অন্যায়ে
তাকে কী ফেরাব আমি। অসম্ভব, অসম্ভব প্রিয়
আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়!

বিপুলা পৃথিবী

একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।

আজ মনে হয় কেন সে গিয়েছিল। সে কি ভেবেছিল তার চিকন মোহ উদ্ভিন্ন করে দেবে অন্ধকারের শরীর? সে কি যেন মেঘলা জল কালো বনের মাথায়? প্রতিটি পাতা তার নন্দন বরণ করে নেবে সবুজ কৃতজ্ঞতায়? আঙুরের আভার মতো দৃষ্টি-ধুয়ে-দেওয়া প্রান্তবেলা?

আজ মনে হয় কেন সে ভেবেছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে সেও এক তামসী বৃক্ষ যে নয়, এই কি তার জীবন?

জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকল মধ্যপথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে। নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠল হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকল তার রাত্রির মতো হৃদয়।

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্ত কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, 'তাকে ঢেকে দাও' 'তাকে ঢেকে দাও' রব করতে-করতে ছিটকে বেড়ালো এধার থেকে ওধার, খসে-পড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, 'তাকে চোখ দাও' 'তাকে চোখ দাও' বলতে-বলতে সীমানাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দু-হাতে।

আজ তুমি, যে-তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে

সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী...

সত্তা

তুমি থেকো, তুমি সবার দৃশ্যগোচর থেকো–
নইলে আমি এ যে কিছুই বুঝতে পারি না।
স্মরণ, বিস্মরণ– তার ঊর্ধ্বে প্রত্যেকে
দেখবে, তুমি মানবী না, স্বপ্নপরী না।

তবে কে ও? তবে কে ও? কোথায় চলেছে ও
অর্ধরাতে অন্ধকারে অবিশ্বাসিনী?
শব্দগুলি অন্ধকার, নীরব, নিঃশ্রেয়–
এখনও না, আমি সীমার প্রান্তে আসিনি।

তুমি থামো তুমি থামো, নিশীথে বন্যতা,
মধ্যে জাহাজ জ্বলে হঠাৎ, তুমি থামো থামো ;
দৃশ্যবিহীন অকূলতায় খোলে জলের জটা
গূঢ় পাতাল, মহাপাতাল, নমো নমো নম!

কিন্তু কেন? নিঃস্ব পদ্ম টানে প্রবল টানে
ভেসে কোথায় যেতে কোথায় ডাকে কে গো, কে গো–
এ যদি হয় সত্তা তবে অস্তিত্বের মানে
থাকা, কেবল থাকা, তুমি বিশ্বগোচর থেকো।

মাতাল

আরো একটু মাতাল করে দাও।
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবে না!

এখনও যে ও যুবক আছে প্রভু!
এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও–
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবে না।

অন্তিম

আমায় বেছে-বেছে বরণ করেছিল
বিশ্ববিধাতার একটি দুরাশা।
এখন দেখছি তা কিছুই পূর্ণ না,
বয়স যদ্যপি মাত্র বিরাশি।

সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায় :
বসতিনির্মাণ, বংশরক্ষা ;
তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে
সিঁদুরচিহ্নের মতন সখ্য!

কিন্তু সখাদের অস্থি ডাক দেয়
মস্ত সময়ের দাঁতের কৌটোয়–
প্রবল বহমান দু-ধারে গর্জিত,
অন্ধ নির্বোধ, টান দে বৈঠা।

পাগল

'এত কিসের গর্জে আকাশ
চিন্তা ভাবনা শরীরপাত?
বেঁচে থাকলেই বাঁচা সহজ,
মরলে মৃত্যু সুনির্ঘাত।'–

ব'লে, একটু চোখ মটকে,
তাকান মস্ত মহাশয়–
'ঈষৎ মাত্র গিলে নিলে
যা সওয়াবেন তাহাই সয়।

'হাওড়া ব্রিজের চূড়োয় উঠুন,
নীচে তাকান, ঊর্ধ্বে চান–
দুটোই মাত্র সম্প্রদায়
নির্বোধ আর বুদ্ধিমান।'

বুড়িরা জটলা করে

বুড়িরা জটলা করে
আগুনের পাড়ায়
দু-ধারে আঁধার জল
পাতাল নাড়ায়।

আবছায়া জাহাজ ঘিরে
মাতালের সাঁতার
কেউ-কেউ আলোক ভাবে
কেউ-কেউ আঁধার।

রাত্রির কুণ্ডলীও
কুয়াশায় কাঁপে
বুড়িদের জটলা নড়ে
অতীতের ভাপে।

বুড়িরা জটলা করে
বুড়িরা জটলা করে

পোকা

খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা
দেয়ালের মধ্য খুঁড়ে জল।
বাহিরে ভরসা ছিল এতকাল শাদা
কোথা হতে নীলাভ গরল–
দেয়ালের মধ্য বুকে জল।

জালের জানালা খোলা, গগনে তাকা–
টিপি-টিপি পাহাড়-চূড়ালি।
যা, যা, নিজে যদি জুড়া তো জুড়ালি।
নতুবা আকাশে দিয়ে ছাই
দেয়ালে-দেয়ালে নড়ে পোকা।

যা, দেয়ালে-দেয়ালে ঘুরে যা–
খা, খা
খুঁড়ে-খুঁড়ে সবই অস্থায়ী
খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা।

প্রতিশ্রুতি

এখন আমি অনেকদিন তোমার মুখে তাকাব না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, তুমি রাখোনি কোনো কথা।
এখন ওরা অনেকদিন আমার মুখে তাকাবে না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি ভেঙেছি নীরবতা।

কেন? কারণ সেই যে-বুড়ি, সেই-যে তিনটে পাকা বুড়ি,
ঘরের সামনে অশথ ঘিরে ঘুরেছে সাতবার,
বাঁধা মুঠি খোলা দু-গাল ধুলোতে আর শাপশাপান্তে
ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে ঘর-বার।

বুকের ভিতর খরদীপালি জ্বালিয়ে বলে 'তালি তালি'
দু-হাতে তালি, ছ-হাতে তালি, শ-হাতে তালি বাজে :
এখন আমি আর কি নারী তোমার মুখে তাকাতে পারি?
কিংবা ওরা আমার মুখের গমক-গমক আঁচে?

কেবল দু-জন দু-ধার থেকে মধ্যে আগুন আড়াল রেখে
খুলে দিয়েছি ছাইয়ের করতল,
গলিত দ্রব নীরবতা যদিও জানে শেষ পরিণাম–
তুমিও জানো, আমিও জানি, সামান্য সম্বল!

কিউ

একটু এগোও একটু এগোও
তখন থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটু এগোও
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক!
মানুষ, মাছি, অন্ধকার মানুষ, মাছি, অন্ধকার
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক-চড়ুক!

জলের সঙ্গে স্রোতের সামনে
মুখের সঙ্গে আলোর সামনে
মানুষ মাছি অন্ধকার একটু নড়ুক-চড়ুক

একটু এগোও, বিসর্পিণী, একটু এগোও...

বাস্তু

আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না
কলকাতায় থাকে।
আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল
জবার পোশাকে!
কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

শুধু ওই যুবকের মুখখানি মনে পড়ে ম্লান,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও কেন গলির কানা বাঁকে
এখনও প্রতীক্ষা করে তাকে!

সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

ভিড়

'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান–'

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?

রাস্তা

'রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন
মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন–'

চশমা ধরে নেমে এলাম
ঘুরতে ঘুরতে নেমে এলাম
ভুবনখানা টলে পড়ল ভুবনডিঙির পায়ে
ফিরে যাব, ফিরে যাব, ফিরব কী উপায়ে?

এক রাস্তা দুই রাস্তা তিন রাস্তা কেউ রাস্তা
রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন।
তিন রাস্তা চার রাস্তা সব রাস্তা সমান
রাস্তা করে নিন।
এক রাস্তা দুই রাস্তা
দুই রাস্তা এক রাস্তা
কেউ রাস্তা দেবে না, রাস্তা করে নিন।

অলস জল

পা-ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে?
কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা?

খুব মনে নেই আকাশ-বাতাস ঠিক কতটা বাংলাদেশের
কতটা তার মিথ্যে ছিল বুকের ভিতর বানিয়ে-তোলা :

নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে
ঘনবিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে!

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম? মাঝি, আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই

স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা?

ফুলবাজার

পদ্ম, তোর মনে পড়ে খালযমুনার এপার-ওপার
রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

স্পষ্ট নৌকো, ছই ছিল না, ভাঙাবৈঠা গ্রাম-হারানো
বন্য মুঠোয় ডাগর সাহস, ফলফুলন্ত নির্জনতা

আড়ালবাঁকে কিশোরী চাল, ছিটকে সরে মুখের জ্যোতি
আমরা ভেবেছিলাম এরই নাম বুঝি-বা জন্মজীবন।

কিন্তু এখন তোর মুখে কী মৃণালবিহীন কাগজ-আভা
সেদিন যখন হেসেছিলি সত্যি মুখের ঢেউ ছিল না।

আমিই আমার নিজের হাতে রঙিন করে দিয়েছিলাম
ছলছলানো মুখোশমালা, সেকথা তুই ভালোই জানিস–

তবু কি তোর ইচ্ছে করে আলগা খোলা শ্যামবাজারে
সবার হাতে ঘুরতে-ঘুরতে বিন্দু-বিন্দু জীবনযাপন?

পিঁপড়ে

পিঁপড়ে রে, তোর পাখা উঠুক
আমি যে আর সইতে পারি না!
সারিবন্দী সারিবন্দী সারিবন্দী মুখ
আমি যে আর দেখতে পারি না।

আলমারিতে খাবার আছে, কিন্তু সে তো আমার জন্য রাখা,
তুই কেন তা খাস? বিশ্রী বদভ্যাস!
আলমারি, প্লেট, বারান্দা, বই, উজাড় টেবিলঢাকা,
গভীর রাতের বিছানাটাও চাস?

পিঁপড়ে রে, তোর বাসা কোথায়? উড়িয়ে দিয়ে পাখা
সেইখানে যা, নয়,
ঝাঁপ দে যমুনায়,
নইলে মস্ত আগুন জ্বেলে চতুর্ধারে নাচ–
পাখা উঠুক পাখা উঠুক পাখা উঠুক তোর
পিঁপড়ে রে, আর সইতে পারি না।

সঙ্ঘ

এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়
ব্যক্তির আবর্তে ঘূর্ণিঘোর,
'মিথ্যাচারী মিথ্যাভাষী, শঠ,
ছিন্ন হয়ে যায় শিশুপাল

কিন্তু ব্যভিচার, রক্তধারা
মুক্তি পায় চক্র ছুঁয়ে যায়–
আরো শত নিষ্ঠুরতা বাকি,
শোকের দ্বেষের পরিপাকে

থাকে শুধু পরিত্রাণহীন
কার শির ছেঁড়ে সুদর্শন?
আমিই মহান, দেখ্ আমাকে'–
এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়!

লক্ষ-লক্ষ জীবন্ত বীজাণু
ঘোরে চাকা দশক দশক।
সে কেবল স্থির প্রচালিত
গড়ে তোলে অদ্বেষ অশোক!

মিলন

কখনো মনে হয় তুমি ধানখেতে ঢেউ, তারই সুগন্ধে গভীর তোমার
উদাত্ত-অনুদাত্তে বাঁধা দেহ, প্রসারিত, হিল্লোলিত

আমি ডুবে যাই নিবিড়ে নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো, শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ণকণা
জীবনের রোমাঞ্চে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মাটির শরীর জাগে কুণ্ডলিত কুয়াশায়

তারই কেন্দ্রে তুমি, তুমি প্রসারিত, হিল্লোলিত, প্রসারিত।

আজ মনে হয় কী ক্ষমাহীন রাতগুলি বেঁধেছিল আমায়। বাইরে তার সজল
মেঘাবরণ, দেখে ভুললে, ভুলে কামনার দুই ঠোঁটে টেনে নিলে বুকের উপর
বারে-বারে, ঘুলিয়ে উঠল অন্তরাত্মা

কিন্তু কাছে এসে দেখলে, হায়, এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার। এই কি
সে দিব্যসজল মুখশ্রীর যৌবন যাকে আমি মগ্ন আকাশের অসংখ্য তারার মতো
চুম্বনকণিকায় ভরে দিতে পারতুম, হায়

ব'লে উদ্‌বেল হলো করুণা তোমার দুই বুকে, যুগল নিশ্বাস প্রবাহিত হলো
ধানখেতের উপর তোমারই সংহত শরীরের মতো, দূরে

আর তার নিপীড়ন দেহ ভরে আস্বাদ করে আস্তে-আস্তে উন্মোচিত হতে থাকে
আমার সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকার!

জল

জল কি তোমার কোনো ব্যথা বোঝে? তবে কেন, তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়? তবে কেন তবে কেন
কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?

ইট

নষ্ট হয়ে যায় প্রভু, নষ্ট হয়ে যায়!
ছিল, নেই– মাত্র এই ; ইটের পাঁজায়
আগুন জ্বালায় রাত্রে দারুণ জ্বালায়
আর সব ধ্যান ধান নষ্ট হয়ে যায়।

বাড়ি

আমি একটি বাড়ি খুঁজছি বহুদিন–
মনে-মনে।
আলোর তরল জলে ভেসে যাব কবে!

বাড়ি কি পেয়েছ তুমি?

বাড়ি তো পেয়েছি আমি বহুদিন–
মনে-মনে,
বাড়ি চাই বাহির-ভুবনে।

ঘর : ১

তোমরা যদি কথা বলতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমি ঘর পেয়েছি,
এসো,
আমার ঘরে উদ্যত বক্তৃতা।

তোমরা যদি ছায়া শুনতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমার মুখের উপর আলো
পিছ-দুয়ারে ছায়া খরস্রোতা।

কিংবা যদি বাহিরই চাও, এসো এসো এসো
নীল পাথরে হাঁটি :

সেই মুহূর্তে নিভে গেল ঘরে সকল বাতি।

ঘর : ২

যে চায় তাকে আনিস
যে যায় তাকে আনিস
যে চায় তাকে আনিস ডেকে আনিস—
ঘরের কাছে আছে অনেক মানুষ।

যে যায় দূরে অনেক দূরে অনেক দূরে-দূরে
অনেক ঘুরে-ঘুরে
যে যায় তাকে আনিস ডেকে আনিস ঘরে আনিস
ঘরের কাছে আছে ঘরের মানুষ!

দু-জন যেতে উজান পথে উজান যেতে-যেতে
ঘরের মুখে আগুন কেন জ্বালিস?

মধ্যরাত

আজ আর কেউ নেই, ঘুমন্ত ঘরের নীল জল,
ঠান্ডা বারান্দার গায়ে মধ্যরাত দেবতার দীপে–
হাতে খেলে যায় হাওয়া।

আজ চুপ করে ভাবো, এই রাত মৃদুজলঢেউ,
বড়ো একাকিনী গাছ, মাঝে-মাঝে কার কাছে যাব,
ঘুমায় ঘরের গায়ে ছায়াময় বাহিত প্রপাত,
বুকে খেলে যায় হাওয়া।

দুইজনে পাশাপাশি, মাঝে কি পথিক নেই কোনো,
এখন বসন খোলো, দেবতা দেখুক দু-নয়নে,
শিশিরে পায়ের ধ্বনি সুদূরতা অধীর জলধি
শুধু বহে যায় হাওয়া।

আজ আর কেউ নেই, মাঝে-মাঝে কার কাছে যাব।

বৃষ্টি

আমার দুঃখের দিন তথাগত
আমার সুখের দিন ভাসমান!
এমন বৃষ্টির দিন পথে-পথে
আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে।

আবার সুখের মাঠ জলভরা
আবার দুঃখের ধান ভরে যায়!
এমন বৃষ্টির দিন মনে পড়ে
আমার জন্মের কোনো শেষ নেই।

মুনিয়া

মুনিয়া সমস্ত দিন বাঁধা ছিল।

খুব বারোটায় উঠে চুপি চুপি খাঁচা খুলে
'উড়ে যা' 'উড়ে যা' বলে প্ররোচনা দিতে
আমার বুকের দিকে তুলে দিল ঠ্যাঙ–

জ্যোৎস্নায় মনে হলো বাঘিনীর থাবা।

রাঙামামিমার গৃহত্যাগ

ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে–

ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!

মধ্যদুপুর

এখন আরো অপরিচয়
এখন আরো ভালো,
যা-কিছু যায় দুপুরে যায় উড়ে।

যেমন ছিল বাঁধাদিনের চতুঃসীমায় বাঁধা,
ঝিমায় ওরা ঝিমায়,
শহর, তার বুকের মধ্যে দীর্ঘ পুকুর, শোনে
দীর্ঘ পুকুর খোলা আকাশ হা-হা,
পুরোনো সব রুপোর বাসন ছড়ানো অঙ্গনে।

দুপুরে যায়, দুপুরে যায়, ঝিমন্ত তন্তুরে
নিভৃতে যায় খুঁড়ে–
কেবল যখন সুপুরিচয় চয়ন করতে এসে
ওরা হঠাৎ নিজের মুখে ভেসে
সামনে দেখে পুকুর–

আমার চতুর্দিকে শহর, চতুর্দিকে আলো,
আমি তখন মধ্যদুপুরবেলা।

হাজারদুয়ারি

একবার তাকাবে না? নিজের মুখের দিকে চোখ ভরে?
মাঝে-মাঝে ফিরে দেখা ভালো নয়?
তুমি হাত ধুতে পারো এত গঙ্গাজল জানে কোন্ দেশ!
মাঝে-মাঝে ধুয়ে নেওয়া ভালো নয়?
তাই আমি আমার দক্ষিণ হাত
রেখেছি নিজের বুকে,
তুমি এসো, মাথা পাতো, যেন কত ঘর ঘুরে এলে
এখন লহরী নয়
যত চুপ তত দূর দুয়ারে দুয়ার খুলে যায়
দুয়ারে দুয়ার খুলে যায়
এই এক শুদ্ধতর
হাজারদুয়ারি ভালোবাসা।

ছুটি

হয়তো এসেছিল। কিন্তু আমি দেখিনি।
এখন কি সে অনেক দূরে চলে গেছে?
যাব যাব। যাব।

সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম।

কী নাম?
আমার কোনো নাম তো নেই, নৌকো বাঁধা আছে দুটি,
দূরে সবাই জাল ফেলেছে সমুদ্রে–

ছুটি, প্রভু, ছুটি!

ভাষা

এই তো, রাত্রি এল। বলো, এখন তোমার কথা বলো।

কিন্তু বলবে কোন্ ভাষায়? না, এই পুরোনো ক্ষয়ে-যাওয়া কথা তোমার ঠোঁটে ধোরো না– সেই তোমার ঠোঁটে, যাকে দেখেছিলুম মলিন মেঘের মতো ঝিমিয়ে থাকতে, কিংবা উথলে উঠতে ঝোড়ো রাতে পদ্মার মত্ত ভালোবাসায়, না– তোমার সেই ঠোঁটে তুলে নিয়ো না কত জন্মের এই ব্যবহৃত ভাষা, জীর্ণ, উচ্ছিষ্ট।

বলবে কোন্ ভাষায়? যে ভাষায় বাচাল প্রকৃতি চিৎকার করতে থাকে আমার চোখের সামনে, তার সব রং একত্রে এসে ঘুলিয়ে দেয় আমার আনন্দের স্বাদ, 'সরে যাও' 'সরে যাও' বলে দৌড়ে বেড়ায় আত্তরাত্মা, না, সেই দারুণ প্রকৃতির রহস্য তুমি তুলো না তোমার ঠোঁটে।

এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন্ পাত্রে? অন্তহীন এই নাস্তি যখন হা হা করে এগিয়ে আসে চোখের উপর, দুলে ওঠে রক্ত– তখন তুমি কথা বলো মহাশূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন, সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী– শষ্পের মতো গহন, গম্ভীর

এই তো, এই তো রাত্রি হলো। বলো, এখন তুমি কথা বলো।

সময়

তোমরা এসেছ তাই তোমাদের বলি
এখনও সময় হয়নি।
একবার এর মুখে একবার অন্য মুখে তাকাবার এইসব প্রহসন
আমার ভালো লাগে না।
যেখানে আমার কবর হবে আজ সেখানে জল দিতে ভুলে গিয়েছি
যেসব শামুক তোমরা রেখে গিয়েছিলে
তার মধ্যে গাঢ় শঙ্খ কোথাও ছিল না
তোমরা এসেছ, তোমাদের বলি
গ্রহে-গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল
আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা অজ্ঞাত সময়।

ভিক্ষা

আর আমাদের এই কয় মুষ্টি ভিক্ষা দেবে প্রিয়।
আমি জানি তুমিও একদিন হবে বিশ্বাসঘাতক
রক্ত নেবে ছল করে বসে আছো—
সব জেনেশুনে তবু জানু পেতে দিই
তোমার নিজের হাতে ভিক্ষা নিতে এত ভালো লাগে!

নাম

কোনো জোর কোরো না আমায়।

শব্দগুলি খুলে যাক, খুলে-খুলে যায়
যেমন-বা ভোর

জলস্রোত বহুদূরে টেনে নিয়ে যেমন পাথর
জনহীন টলটল শব্দ করে

দিগন্তের ঘরে
আমাদের নাম মুছে যায় চুপচাপ। খুব ক্ষীণ

টুপটুপ খুলে পড়ে ঘাসের মাথায় নীল, আর কোনো দিন
কোনো জোর কোরো না আমাকে।

এম্‌নি ভাষা

মনে কি ভাবো লাজুক, লজ্জাশীলা?
এসব আমার অনেক হলো
এখন
রাস্তা জুড়ে থমকে আছে ট্রামের সেতু
দীর্ঘ তবু অনিশ্চিত বৈদ্যুতিক।
কোথায় যাবে যাত্রীদল, যাত্রিণীদল, চকঝমকের যাত্রিণীদল?
এসো, আমার অল্প পায়ের সঙ্গে নামো।
মনে কি ভাবো লাজুক? আমার এমনি ভাষা।

সহজ

আমিই সবার চেয়ে কম বুঝি, তাই
আচম্বিতে আমার বাঁ-পাশে এসে হেসে
পিঠ ছুঁয়ে চলে যাও ;
'অত কি সহজ?' বল তুমি।

তার পর আমার কী বাকি থাকে? অপরাধ
আমার দু-পাশে কেন কাশফুল হয়ে ভরে ওঠে?
শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেন-বা আমিই শস্যভূমি—
অত যে সহজ নয় মাঝে-মাঝে তাও ভুলে যাই।

প্রতীক্ষা

কড়িকাঠ থেকে বুকের রক্ত পর্যন্ত ঝুলে-পড়া মাকড়সা
অনেকদিন পরে ঢুকতে গেলে জাল জড়িয়ে ধরে মাথায়,
বলে– এসো এসো, এই তো কত গ্রীষ্ম বর্ষা
কত শীত হেমন্ত বসে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, এসো–
ব'লে ভিজে অন্ধকারে মনোহীনতার গন্ধে টেনে নিতে-নিতে
শুষে নেয় আমার সমস্ত উদ্ভিদ, আমার অন্তরাত্মা।

প্রতিহিংসা

যুবতী কিছু জানে না, শুধু
  প্রেমের কথা ব'লে
দেহ আমার সাজিয়েছিল
প্রাচীন বল্কলে।

আমিও পরিবর্তে তার
  রেখেছি সব কথা :
শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি
আগুন, প্রবণতা।

গুল্ম, ঈথার

আমি যখন নিচু হয়ে পাথরকুচি কুড়াই
কয়েকটা জটিল গুল্মের ছায়া পড়ে আমার মুখে
আড়াআড়ি।

আর যখন শূন্যমুখে উলটোমুখে আকাশে তুলে দিই হাত
মুখের কিনার ঘিরে ঢেউ দেয় জয়ন্ত ঈথার আভাময়
অদৃশ্যতা।

'ও এমন একই সঙ্গে দু-রকম কেন?'– ওরা ভাবে।

দ্বা সুপর্ণা

'কেমন করে পারো এমন স্বাভাবিক আর স্বাদু আহার
সব জায়গায় মানিয়ে যাও কিছুই তোমার নিজস্ব নয়
কেমন করে পারো?'

'নষ্ট আমি কিছুই আমার নিজস্ব নয় ; ডালে-ডালে
পাতায়-পাতায় স্বাদু আহার বিষ অথবা বাঁচার আগুন
ধরে ব্যাপক মাটি—
দীর্ঘতর বট, এমন জটিলঝুরি সমকালীন
সব জায়গায় থাকি, আমার
অন্য একটি পাখি কেবল আড়াল করে রাখি।'

চরিত্র

এক পাথরে বসে থাকার অনন্যতা হয়তো ভালো।
তোমাকে সব দেখতে পায়, তুমিও সব দেখতে পাও
মুখের সঙ্গে মুখের ছায়া স্থির ছবিতে নিসর্গ, তা-ও
হয়তো ভালো। সত্যি ভালো?

নাকি পাথর থেকে পাথর টপ্‌কে চলার যখন-তখন?
পাহাড়পায়ে প্রণত পথ
অল্প নীচে বুকের জমি ভরে যাবার উড়ন্-নদী
স্বচ্ছ এবং নগ্ন তরল

টপ্‌কে চলা, নিসর্গপট ওলটপালট মুখের আড়ে
নীলসবুজে লড়াই সারে
পিছনে চুল মেঘলা ওড়ে, নবীন শরীর চলচ্ছবি
পাথর থেকে পাথরে যায় ঐ যুবতী, জীবনসমান
সেই যাওয়া কি চরিত্র নয়?
আরেক রকম চরিত্রবান।

যখন প্রহর শান্ত

যখন প্রহর শান্ত, মধ্যম, নিবিড় আভাসিনী
সমস্ত ব্যসন কাম উজ্জ্বলতা ঘুমিয়ে পড়েছে
বাহির-দুয়ারে চাবি, আমি নতজানু একা
আমার নিজের কাছে ক্ষমা চাই, পরিত্রাণ, প্রতিটি শব্দের শাস্তি–
বধির দিনের যাত্রী :
কর্মে ছিল অধিকার, আমাকে কি সমর্পণ সাজে?

চাবি

.
জাল করেছে জাল করেছে ওরা আমার সই
জাল করেছে– ব'লে যেমন ধরতে গেলাম চোর
ঘুরিয়ে দিয়ে মুখ
দেখি, এ কী, এ তো আমিই, আমিই দুঃসাহসে
জাল করেছি জাল করেছি, হা রে আমার সই
জাল করেছি আমি আমার সর্বনাশের চাবি।

আড়াল

আমি আড়াল চেয়েছিলাম চার কিনারে।
কিন্তু প্রভু ভুল কোরো না
রাত্রিসকাল
পথই আমার পথের আড়াল।

দু-হাত তোমায় বাড়িয়ে দিইনি সে কি কেবল আত্মাভিমান?
যখন মুঠো খুলতে গেছি হাতের রেখায় দীনাতিদীন
কাল রজনীর নিষ্ফলতা চাবুক মারে।

এখনও ঠিক সময় তো নয়, শরীর আমার জন্মজামিন
পথিক জনস্রোতের টান
তার ভিতরে এমন উজান
আমি আড়াল চেয়েছিলাম পিছনদাঁড়ে।

দেহ

আসছিলুম সনাতনীর মাঠ পেরিয়ে।
বুকেও অল্প চাপ ছিল, সলতে জ্বলার তাপ ছিল,
মুখোমুখি হতেও পারে গ্রহের ফেরে।
পাশে পাশে সতর্জন
'দেহ কোথায়' 'দেহ কোথায়' বলতে বলতে তাড়া করল
নাগরজন!
এখন ওসব শুনতে পাই না, পকেটে এক ঝাপসা আয়না,
ভাঙা চিরুনি, চাদরমুড়ি, নৌকোচটি—
আসছিলুম, আসছিলুম তোমার প্রতি।

জন্মদিন

ছিল দিন জন্মদিন তোমার উৎসবে কাল রাত
প্রখর কৌতুকে ছিল তরলবসনা নারীদল
যাবার বেলায় ছটা পরিচ্ছিন্ন মাংস আর হাড়
'বন্ধ করো দ্বার' বলে খলখল নেমেছিল হাসি
বাইরে যে পাখি ছিল মনেও পড়েনি তার নাম
আমি ফুল বুকে নিয়ে লজ্জাহীন ঘুমিয়ে পড়েছি
সুযোগের পাশাপাশি প্রতিহারী ছিল যে বেড়াল
আমার একাকী পাখি খুন করে খেয়ে গেছে কাল।

নষ্ট

নষ্ট হয়ে যাবার পথে গিয়েছিলুম, প্রভু আমার!
তুমি আমার
নষ্ট হবার সমস্ত ঋণ
কোটর ভরে রেখেছিলে।

কিন্তু তোমার অমোঘ মুঠি ধরে বুকের মোরগঝুঁটি
সন্ধ্যাবেলা শুধু আমার
মুখের রঙে
ঝরে পড়ার ঝরে পড়ার
ঝরে পড়ার শব্দ জানে তুমি আমার নষ্ট প্রভু।

উদাসীনা

পা ছুঁয়ে যে প্রণাম করি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
নির্জীব পা সরিয়ে নাও কিনা।

দুঃখ এত ঝরাই, সে কি জানতে চেয়ে দেবদূতেরা কী চান?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
তোমার মুখে সত্যিকারের ঘৃণা।

এখন আমি বুঝতে পারি আমায় নিয়ে কী চাও তুমি।
দুপুরজ্বালার মধ্যখানে
সূত্রপাতে অবসানে
তুমি আমায় দেখতে চেয়েছিলে
দু-হাত ধরেও থাকব উদাসীনা।

সুন্দর

লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি, এমন কিছু নয়
নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।
কিছু তো দেখবে লোকে, তাই দেখি, ফসলের সীমা,
বুকের গেরুয়া জল, দ্বাদশীতে সব গ্রাম মিলেমিশে যায়
জেগে ওঠে রাত।
স্বভাবই তো পথ হারানো, তাই পথ হারিয়ে ফেলেছি
তবে জানি, মনে পড়ে কে এনেছে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে।
পাহাড়িয়া নিঃসাড়, কথকতা ছিল না কোথাও,
গোপনে নিজেই আমি মাছ ধরবার নাম করে
ডুবিয়ে দিয়েছি তাকে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে।
ধনুক ছোঁড়েনি কেউ, বেঁচে গেছি, খুব বেঁচে গেছি,
নিখাত পাতালছায়া ভরে দেয় দিগন্তদখিনা।

লোকে তো জানে না কিছু। জানুক না, টেনে নিক পাপ,
ঝরে যায় নীল স্রোত, গাঢ় খাদে করুণার টান–
যদি-বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে :
'তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছো কেন পৃথিবীতে?'

এই নদী, একা

গা থেকে সমস্ত যদি খুলে পড়ে যায়, আবার নতুন হয়ে ওঠা সজীবতা
এর কোনো মানে আছে। অপরাধী? প্রতিদিন কত পাপ করি
তুমি তার কতটুকু জানো?
হাতের মায়ায় কত অভিশাপ সঞ্চিত রেখেছি, পাশাপাশি নদী,
তাও সব খুলে যায় ; চেনা শহরের থেকে দূরে
উঁচুনিচু সবুজের ঢল
তার পাশে মাঝে মাঝে নত হতে ভালো লাগে লাবণ্যে উদ্ভিদ
তুমি তার কতটুকু জানো? এই নদী, একা

দু-চোখ সূর্যাস্তে রাখে প্রবাহিত, বলে
আমি কি অনেক দূরে সরে গেছি?

শুশুনিয়া

ক্রমশ মিলায় দূরে শুশুনিয়া, বাংলা চাল
সাঁওতালসঙ্ঘের আদিমানবীর চোখ
আবার নতুন করে ঘিরে পাওয়া অবিশ্বাস, ভয়

যদিও কোথাও নেই, তবু এই গোধূলি সুঠাম
বাঁকুড়ার ঘোড়া মধ্যমাঠে, মুহূর্তে সমস্ত স্থির
এমনকী মুহূর্তই স্থির

আমরা সবাই খুব পরিমিত স্বাভাবিক কথা বলি
কিছুই ঘটেনি যেন, সত্যিও ঘটেনি কিছু, তবু
যেসব প্রপাতধারা কখনো দেখিনি তার আসে শুশুনিয়া

পাথরপ্রকীর্ণ দুঃখ, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসা
সিঁথিপথে লতানো বিষাক্ত বীজ
তাছাড়া আমারও হাত অন্য মানবীর হাতে ধরা

আর তুমি
পাহাড়ের পায়ে বসে কেঁপে ওঠো সতেজ ঝর্নার জল ঠোঁটে
দশ দিকে প্রকৃতি বিস্তর খোলা

আমার মুখেও কি না খুলে যায় ষোলো আনা লোভ
জলই জীবন, দস্যু জল–

ক্রমশ মিলায় দূরে শুশুনিয়া, বাংলা চাল
সহায় সম্বল!

মিথ্যে

এই মুখ ঠিক মুখ নয়
মিথ্যে লেগে আছে
এখন তোমার কাছে যাওয়া
ভালো না আমার।

তুমি স্নেহে সুদক্ষিণা বটে
মেঘময় ঠোঁট নেমে আসে
তোমার চোখের জলে আজও
পুণ্যে ভরে ওঠে রুদ্ধ দেশ
আমি তবু ছিঁড়ে যাই দূরে
এই মুখ ঠিক মুখ নয়
হলুদ শরীর থেমে যায়
বোধহীন, তাপী
তোমার অনেক দেওয়া হলো
আমার সমস্ত দেওয়া বাকি।

অশুচি

সবাই সতর্ক থাকে দুপুরে বা মধ্যরাতে তুলে দেয় খিল
পথের ভিখিরি মা-ও ভাঙা ক্রাচে ভর করে বুঝে নেয় মাছির গুঞ্জন
আমারই সহজ কোনো প্রতিরক্ষা নেই
চুরি হয়ে যায় সব বাক্স বই সামঞ্জস্য
অথবা শুচিতা।

তাই পথে পথে ঘুরি, ফিরে যায় গৈরিক গোধূলি
এমন মুহূর্তগুলি চিতায় তুলেছি আজ চণ্ডালের মতো
তবু কেন
আমি যদি এতই অশুচি তবে পথিকেরা আজও কেন জল চায়
আমার দুয়ারে?

ভিখারি বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও

আমাকে কি নিতে চাও? কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দুই হাতে ঝরাও ঝালর

আমাকে কি নেবে তুমি? কখনো দেখিনি আগে চোখে
এত নিরুপম ভালোবাসা

তোমার মেদুর হাসি ধরেছি বিশ্বের পাশাপাশি
আণবী ছটায় জ্বলে ঠোঁট

আমাকে কি নিতে চাও? নেবে কোন্ শূন্য মাঠ থেকে?
হায় তুমি অন্নপূর্ণা আজ!

চাও শুধু সমর্পণ, একে একে সব নাও খুলে
মেদ মজ্জা হৃদয় মগজ

তারও পরে চাও আমি খোলাপথে হাঁটু ভেঙে বসে
হাতে নেব এনামেল বাটি

জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দিন দিনে চাও পদতলে

ভিখারি বানাও, কিন্তু মনে মনে জানোনি কখনো
তুমি তো তেমন গৌরী নও।

দশমী

তবে যাই
যাই মণ্ডপের পাশে ফুলতোলা ভোরবেলা যাই
খাল ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠে-আসা আলো

যাই উদাসীন দেহে গুরুগুরু বোধনের ধ্বনি
যাই সনাতন বলিদান

কপালে দীঘল ভালো পূজার প্রণাম
যাই মুখঢাকা জবা চত্বর অঙ্গন বনময়

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার

মঠের কিনার ঘিরে কেঁপেওঠা বনবাসী হাওয়া
যাই পিতৃপুরুষের প্রদীপ-বসানো দুঃখ, আর

ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধূলির দেশ
আমি যাই

পুনর্বাসন

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ঘাসপাথর
সরীসৃপ
ভাঙা মন্দির
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
নির্বাসন
কথামালা
একলা সূর্যাস্ত
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বস
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিমমুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল

ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন।

যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শেয়ালদা
ভরদুপুর
উলকি দেয়াল
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
কানাগলি
স্লোগান
মনুমেন্ট
যা কিছু আমার চারপাশে আছে
শরশয্যা
ল্যাম্পোস্ট
লাল গঙ্গা
সমস্ত একসঙ্গে ঘিরে ধরে মজ্জার অন্ধকার
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজে জলতরঙ্গ
চুড়োয় শূন্য তুলে ধরে হাওড়া ব্রিজ
পায়ের নীচে গড়িয়ে যায় আবহমান।

যা কিছু আমার চারপাশে ঝর্না
উড়ন্ত চুল
উদোম পথ
ঝোড়ো মশাল
যা কিছু আমার চারপাশে স্বচ্ছ
ভোরের শব্দ
স্নাত শরীর
শ্মশানশিব
যা কিছু আমার চারপাশে মৃত্যু
একেক দিন
হাজার দিন
জন্মদিন
সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে
অল্প আলোয় বসে-থাকা পথভিখারি

যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন।

ভূমধ্যসাগর

আমাদের দেখা হলো আচম্বিতে
অধিকন্তু শীতে
পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী
দুই প্রান্ত থেকে ফিরে আমাদের দেখা হলো ভূমধ্যসাগরে।

হাতে হাত তুলে নিই, তুমি স্রোতে কেঁপে ওঠো, বলো
'এ কী
কী সাজে সেজেছ নেশাতুর
তোমারও দু-হাতে কেন কলঙ্করেখার উচ্ছলতা
দেখো কত দীন হয়ে গেছ
সমস্ত শরীর জুড়ে বিসর্পিণী অত্যাচার অপব্যয় ছন্নছাড়া ভয়
এ তো নয় যাকে আমি রচনা করেছি স্তব্ধ রাতে
কেন তুমি এলে
আমাদের দেখা হলো এ কোন্ শীতার্ত পাংশু পটে
পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী!'

ঠিক, সব জানি
আমরা অনেকদিন মুখোমুখি বসিনি সহজে।
তোমার শ্যামল মুখে আজও আছে সজীব সঞ্চার
পটভূমিকায় ওড়ে সমুদ্রের আন্তরিক হাওয়া
আমি ভ্রষ্ট উপদ্রব নিয়ে ফিরি মেরুদণ্ড ঘিরে
এমনকী সমুদ্রে ফেলি ছিপ
কিন্তু তবু
ছেড়ে দাও হাত, শুধু দেখো এই নীলাভ তর্জনী
ভূমধ্যসাগর
পুব বা পশ্চিম নয়, দেখো ওই দক্ষিণ জগৎ
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জ্বলে ওঠে দূর বন্য অন্তরাল ভেঙে।

তাই এইখানে নেমে আমাকে প্রণত হতে হয়
আমারও চোখের জলে ভরে যায় অরুণা ধরণী
দু-হাতে কলঙ্ক বটে, তবু
আমারই শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ
মৃত্যুর ঝমকে আর ঝোপে ঝোপে দিব্য প্রহরণে।
কলঙ্কে রেখো না কোনো ভয়
এমন কলঙ্ক নেই যা এই দাহের চেয়ে বড়ো
এমন আগুন নেই যা আরো দেহের শুদ্ধি জানে
তুমি আমি কেউ নই, শুধু মুহূর্তের নির্বাপণ
আমাদের ফিরে যেতে হয় বারে বারে
দেশে দেশে ফিরে ফিরে ঘুরে যেতে হয়
পরস্পর অঞ্জলিতে রাখি যত উদ্যত প্রণয়
সে তো শুধু জলাঞ্জলি নয়, তারই বীজে
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে
তাই এইখানে নেমে আমাদের দেখা হলো সমুদ্রের পর্যটক তটে।

ধূপের মতন দীর্ঘ উড়ে যায় মেঘাচ্ছন্ন দিন
তোমারও শরীর আজ মিলে যায় সমুদ্রের রঙে
আমাদের দেখা হয় আচম্বিতে ভূমধ্যসাগরে।
কখনো মসৃণ নয় দেখো আমাদের ভালোবাসা
তোমাকে কতটা জানি তুমি-বা আমাকে কত জানো
তাই আমাদের ভালোবাসা
প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাপে
আমি যদি নষ্ট হই তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
তোমার ক্ষমার সজীবতা
আমার সঞ্চার আরো দীপ্য করে দেশ দেশান্তরে
আর মধ্যজলে
চোখে চোখে জ্বলে ওঠে ঘোর কৃষ্ণ বিস্ফারিত সসাগরা তৃতীয় ভুবন।

ফেরার সময় হলো, এসো সব সাজ খুলে ফেলি
দুই হাতে আপন্ন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে

দিন হয়ে এল ক্ষীণ ভূমধ্যসাগরে।

আরুণি উদ্দালক

আরুণি বললেন, আমি জ্ঞানার্থী। গুরু আদেশ করলেন, যাও, আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধো। পরে তাঁর ব্যাকুল আহ্বানে উঠে এসে বললেন আরুণি, জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে আলে আমি শুয়ে ছিলাম, এখন আজ্ঞা করুন। ধৌম্য জানালেন, কেদারখণ্ড বিদারণ করে উঠেছ বলে তুমি উদ্দালক, সমস্ত বেদ তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক। পৌষ্য পর্বাধ্যায়, আদিপর্ব, মহাভারত।

.

তবে কি আমিই ভুলে যাই? দিকচক্রবাল শুধু বাসা বানাবার অন্য ছল?
তবে কি অস্তিত্ব বড়ো অস্তিত্বের বেদনার চেয়ে? কার বাসা? কতখানি বাসা?
তোমার সমগ্র সত্তা যতক্ষণ না-দাও আমাকে
ততক্ষণ কোনো জ্ঞান নেই
ততক্ষণ পুরোনো ধ্বংসের ধারে অবসন্ন শরিকের দিঘি।
নীল কাচে আলো লেগে প্রতিফলনের মতো স্মৃতি, রাজবাড়ি
কবুতর ওড়ানো চত্বর
ভাঙা গ্রামে পড়ে আছো, শোনো
তবু একজন ছিল এই ধুলাশহরে আরুণি
সে আমাকে বলে গিয়েছিল আল বেঁধে দেবে সে শরীরে।

আমি গুরু অভিমানে বসে আছি সেই থেকে, দিন যায়– রাত
আবার রাত্রির পরে দিন, অস্পষ্ট দু-হাত
নেমে আসে জানুর উপরে
জানা ও কাজের মধ্যে বহু সেতু, দেখাশোনা নেই
ঘরে ঘরে সকলেই নিঃসঙ্গ প্রস্তুত করে লক্ষ্মী-উপাসনা
যে যার আপনসুখে চলে যায় পূর্ণিমার দিকে
আমার নিঃশীল বসে থাকা
বিকল্প বন্ধুতা দেয় ঘটে জমে-থাকা জল অলস মন্থর
হৃদয়ের কাছাকাছি মুখ নিলে ঘুরে যায় পাঁচটি পল্লব পাঁচ দিকে
আর সেই অবসরে ফেটে যায় জলস্রোত, কেননা প্রকৃতি নাকি শূন্যের বিরোধী।

হাঁটুজল বুকজল গলাজল
শান্তিজল হয়ে ওঠে নীলজল পীতজল গলাজল
ঘট ভেঙে আমাদের ধরে ফেলে অতর্কিতে ভাসমান শূন্যের বিরোধী
মধ্যরাত ছুঁড়ে দিলে নিজের পায়ের ভর খুলে যায় পঞ্চশীলময়

আর সেই অবসরে ছোটে বাণিজ্যের ঢেউ ছলনা প্রস্তুত থাকে দিগন্ত অবধি
যে-কোনো আঘাত লেগে উড়ে আসে চালচিত্র ধ্বসে যায় প্রাচীরের তল
কে কোথায় আছো বলে টলে পড়ে যায় সব কবুতর ভাঙা রাজবাড়ি
তোমাদের হাতেগড়া একাল-ওকাল-জোড়া ব্রিজগুলি ঝলকে মিলায়
পাশের বাড়ির বৌ শেষরাতে অন্ধকার ডানা ঝাপটায় খোলা স্রোতে
এদিকে সকাল আসে প্রায় পরিহাসময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগ্য রুপালি ঠমকে।

বলে গিয়েছিল বটে, আছে কি না-আছে কে বা জানে
ভুলে যায় লোকে।
আবার সমস্ত দিক স্থির করে জল
এ-ও এক জন্মাষ্টমী যখন দু-হাত-জোড়া নীল শিশু হাতে নিঃস্ব দেহ
জল ভেঙে যায়
আলোর কুসুমতাপে ছড়ানো গো-কুল
যে-কোনো যমুনা থেকে পায়ে বাজে বিপরীত চৌকাঠে জড়ানো তিন বোন
মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর।

গড়ে তুলবার দিকে মন দেওয়া হয়নি আর কী
সহজেই বাঁধ ভেঙে যায়
চেতাবনি ছিল ঠিক, তুমি-আমি লক্ষই করিনি
কার ছিল কতখানি দায়
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে সরে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষই করিনি
আমার চোখের দিকে যে ভিখারি হেসে যায় আমি আজ তার কাছে ঋণী
এত দ্বিধা কেন বলে লাঞ্ছনা করেছে যারা তাদের সবার কাছে ঋণ
অবনত দিন
ভাবে, একা বাঁধ দেবে, তা কি কখনোই হতে পারে?
আমাদের বিশ্বাস ঘটে না
আমাদের ঘরে ঘরে প্রতি পায়ে জমে ওঠে পলি
আর অলিগলি
আতুর বৃদ্ধের হাতে খুঁজে ফেরে হারানো শরীর
আমাদের ঠোঁটে ওঠে হাসি
দুপুরে বাতাসভরা কেঁপেওঠা অশথের পাতা

যেমন নির্জন শব্দ তোলে
এখনও অম্বার স্বর ততখানি ঝরে পড়ে 'সুমন সুমন'
আমাদের চোখে ভাসে সাবেক করুণা
অথবা কখনো
নিজেরই অথর্ব দেহ যেমন ধিক্কারে টেনে প্রতি রাত্রিবেলা
তোমার মুক্তির পায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই
তেমনই দূরের জলে দিয়ে আসি মৃত গাভী গলিত শূকর আর তোমাকেও মা
মুখে যে আগুন রাখি তত পুণ্য রটে না আমার
মৃত্যুশোকে কার অধিকার
কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনও নদীর জলে 'সুমন, সুমন'
আর আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো–
শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন
তৃষ্ণাদেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।

কখনো চোখের জল হয়ে ওঠে সোনা
কিন্তু কখন? সে কি এই আচ্ছন্ন বিলাপে?
দীর্ঘ আলপথ ঘুরে এই কুব্জ ক্যারাভান তোমার দুয়ারে এসে ভিখারি দাঁড়ায়
আর তুমি
শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন
রাত্রিগুলি ওড়াও আকাশে
বণিকের মানদণ্ড মেরুদণ্ড বানাও শরীরে
বেতন জোগাও চোখে প্রত্যহযাপনছলে রাজপথে অন্ধকার ঘরে
তখন?
হে নগর, দীপান্বিতা ভাস্বতী নগরী
আকণ্ঠ নাগরী
মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন
তোমার রাত্রির গায়ে তার চেয়ে বেশি ফুলঝুরি
পোহালে শর্বরী
তোমারই প্রভাতফেরি মেতে ওঠে ত্রাণমহোৎসবে।

হবে, তাও হবে। মাথা খুব নিচু করে সবুজ গুল্মের ছায়া মুখে তুলে নিলে
ওর দেহ হয়ে ওঠে আমাদেরই দেহ, তাছাড়া এ অভিজ্ঞতার
অন্য কোনো মানে নেই

যখন আঙুল থেকে খুলে পড়ে নির্মল নির্ঝর
তখনও দুখানি হাত দুঃখের দক্ষিণ পাশে স্থির রাখা
আরো একবার ভালোবাসা
এই শুধু, আর কোনো জ্ঞান নেই
আর সব উন্নয়ন পরিত্রাণ ঘূর্ণমান অগণ্য বিপণি দেশ জুড়ে
যা দেয় তা নেবার যোগ্য নয়
আমাদের চেতনাই ক্রমশ অস্পষ্ট করে সাহায্যের হাত
আছে সব সমর্পণে– এমনকী ধ্বংসের মধ্যে– আবার নিজের কাছে
ফিরে আসা, বাঁচা। তাই
যে বলেছে আজও এই প্লাবনে সংক্ষোভে মেঘে আমার সমস্ত জ্ঞান চাই
সে বড়ো প্রত্যক্ষ চোখে আপন শরীর নিয়ে বাঁধ দিতে গিয়েছিল জলে–

লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে।

জাবাল সত্যকাম

আচার্য বললেন, এমন বাক্য ব্রাহ্মণেই সম্ভব। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ করো, তোমায় উপনীত করব, কারণ সত্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হওনি। ক্ষীণ ও দুর্বল গোধনের চারশো তাঁকে পৃথক করে দিয়ে বললেন, অনুগমন করো। বনাভিমুখে তাদের চালিত করে সত্যকাম জানালেন 'সহস্র পূর্ণ না হলে আমি ফিরব না'॥ ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪

তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই নির্জন রাখাল।
তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই এমন সকালসন্ধ্যা
আজানু বসেছি এই উদাসীন মর্যাদায়
চেয়ে আছি নিঃস্ব চোখে চোখে।
এ কি ভালোবাসে ওকে? ও কি একে ভালোবাসে?
আমারই দু-হাতে যেন পরিচর্যা পায়
ভালোবাসাবাসি করে। যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক বায়বীয় স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে

এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই
এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস।

২

ভাবো সেই সন্ধ্যাজাল অস্ফুট বাতাস আমি আভাময় পায়ে হেঁটে গেছি
পাথরবিছানো পথে পথে
তোমার দুঃখের পাশে দীক্ষা নেব ইচ্ছা ছিল কত
প্রেমের পল্লব সর্বঘটে
ভেবেছি এত যে দল, দল দল, আমারও কি জায়গা নেই কোনো?
মাঠের বিপুল ভেঙে দোলানোলণ্ঠন যায়, দূরে সরে বালকের স্মৃতি
প্রধান সড়কে আমি, আমারও কি জায়গা নেই কোনো?
পদ্মার তুফান দেয় টান নৌকো খান খান
পেরিয়ে এসেছি কত সেতু
তোমার দুঃখের পাশে বসে আছে জনবল চোখে রুপা ইলিশের দ্যুতি
আমিও প্রণাম করি বুকে লাগে শ্যামল বিনয়ভূমি, তুমি
মাথায় রেখেছ হাত স্নেহভরে, বলো
'কী তোমার গোত্রপরিচয়?'

পরিচয়? কেন পরিচয় চাও প্রভু?
ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋদ্ধপরিচয়?
বনে ভরে আগুনকুসুম–
আপন সোপানে কারা জলস্রোতে দেখেছিল মুখ?
বুকে জ্বলে আগুনকুসুম–
আমি যে আমিই এই পরিচয়ে ভরে না হৃদয়?
কেন চাও আত্মপরিচয়?
কোথায় আমার দেশ কোন্ স্থিতি মৃত্তিকার কুল
কোন্ চোখে চোখ রেখে বুকের আকাশ ভরে মেঘে
দেশদেশান্তর কালকালান্তর কোথায় আমার ঘর
তুমি চাও গোত্রপরিচয়।
পিছনে পিছনে এত বাঁধা আছে হৃদয়ের মানে আর
শিকড়ে শিকড়ে জমে টান
গঙ্গা এত বহমান দীর্ঘ দেশকাল জুড়ে আমারও হৃদয়
ধুলো পায়ে ফিরে বলে কোথায় আমার গোত্র
কী আমার পরিচয় মা?

ছুটে সরে যাই দূরে ঘরে পরে সদরে অন্দরে
কী আমার পরিচয় মা
শহরে ডকে ও গ্রামে ফুলে ওঠে পরিশ্রম গাছে ওড়ে রঙিন বেলুন
কী আমার পরিচয় মা
ধরো নদীতীর শোনো শব্দ যেন জমে ছিল জাহাজের সারি
জেটিতে জুটায় ভালোবাসা
টন টন শস্যে মুখ ঢেকে যায় রৌদ্রহীন শস্যের শরীর গলে যায়
কী আমার পরিচয় মা
পোশাকের নীচে আমি আমার ভিতরে জমে নির্বোধ পোশাক
আমার দেহের কোনো পরিত্রাণ থাক না-ই থাক
মুখে ঠিক উঠেছিল গ্রাস
কী আমার পরিচয় মা
দারুণ কুঠারে কেউ ছিঁড়ে দিয়েছিল দড়ি
দ্রুত খুলে যায় সব তরী
টেবিলে গেলাস রেখে উঠে আসে প্রণয়িনী হাত ভাঁজ করে বলে, এসো,
কনুই বাঁকিয়ে ওরা মিশে যায় ক্রিসমাস ভিড়ে
টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট
কিছুতেই কিছু নয় ললাটে না ভাষায় না
নতনীল বুকে কিছু নয়
আমার জিভের বিষে ঝরে যায় জরতী ভিখারি
সব গাড়ি থেমে থাকে রমণীর রক্তিম নখরে
কী আমার পরিচয় মা?

৩
বহুপরিচর্যাজাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।
ওরা হাসাহাসি করে, মুখে থুতু দেয়, ঢিল ছুঁড়ে মারে, আমি
পরিচয়হীন
জলস্থল সর্বতল আমার বিলাপে কাঁপে পরিচয়হীন
গোপনে আপনভূমি ক্ষয়ে যায় কবে
যেমন চোখের আড়ে সরে যায় বসন্তবয়স আর
পিয়ানোর পিঠে জমে ধুলো
যেমন উত্তান রাত কেঁপে ওঠে মহোৎসবে নীল
হাতে হাত ছুঁয়ে গেলে বিষ হয়ে ফুলে ওঠে শিরা ও ধমনী, ওরা বলে
কিছুতেই কিছু নয় ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় কিছু নয়,

কী-বা আসে যায়
বুকের তোরণে কোনো স্বাগতম রাখেনি যুবতী
কী সুন্দর মালা আজ পরেছ গলায়
আজ মনে পড়ে মাগো তোমার সিঁদুর এই নিখিল ভুবনে
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে
ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় নয় চোখের নিহিত জলে নয়
আমি খুব নিচু হয়ে তোমার পায়ের কাছে বলি, আজ ক্ষমা করো প্রভু
আয়তনহীন এই দশ দিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই।

বহুপরিচর্যাজাত পথের ভিক্ষায় জন্মদিন
প্রভু এই এনেছি সমিধ
অন্ধকার বনচ্ছায়ে দীর্ঘ তালবীথি সত্যকাম
এনেছি সমিধ
আমার শরীর নাও দুই হাতে পুঁথি ও হৃদয়
তুমি চাও আত্মপরিচয়
শস্যময় ভালোবাসা প্রান্তরে নিহিত বর্তমান
আমার তো নাম নেই, তুমি বলেছিলে সত্যকাম।

এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই।
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক গাঢ়তর স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে
এখন আজানু এই উদাসীন মাঠে মাঠে আমার সকাল
তুমি দিয়েছিলে ভার আমি তাই নির্জন রাখাল।

পাথর

পাথর, নিজেই আমি দিনে দিনে তুলেছি এ বুকে
আজ আর নামাতে পারি না!

আজ অভিশাপ দিই, বলি, ভুল নেমে যা নেমে যা
আবার প্রথম থেকে চাই
দাঁড়াবার মতো চাই যেভাবে দাঁড়ায় মানুষেরা

মাথায় উধাও দিন হাতের কোটরে লিপ্ত রাত
কী ভাবে বা আশা করো মন বুঝে নেবে অন্য লোকে
সমস্ত শরীর জুড়ে নবীনতা জাগেনি কখনো

মুহূর্ত মুহূর্ত শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা
কার পূজা ছিল এতদিন?
একা হও একা হও একা হও একা হও একা

আজ খুব নিচু করে বলি, তুই নেমে যা নেমে যা
পাথর, দেবতা ভেবে বুকে তুলেছিলাম, এখন
আমি তোর সব কথা জানি!

অবিমৃশ্য বালি

পথে এসে মনে পড়ে বন্ধু বলেছিল এই সবই।

বলেছিল, যা, কিন্তু সমস্ত লাবণ্য তোর হেলায় হারাবি।
দুপুরের বিষ লেগে নষ্ট হয়ে যাবে দুই চোখ
বিকেলের মতো খুব নিরাশ্বাস হয়ে যাবে মাথা
গায়ের কলঙ্ক যেন নিশীথের হাজার তারার
দাহ নিয়ে জ্বলে যায়, আর
নিজেই নিজেকে খুঁড়ে দিন-দিন পাবি অন্তহীন
অবিমৃশ্য বালি–

আমাকে ঠকালি যদি, নিজেকে তো এতটা নামালি!

বিষ

হাত খুলে দেখা গেল হাতে কিছু নেই
এবার তাহলে খোলো পা

খোলা হলো পা
তাও নেই! তাহলে কি মাথা? খোলো মাথা

তার পরে একে একে খোলা হলো মাথা ঘাড় বুক পিঠ উরু
কোনোখানে নেই কোনো বিষ।

কিন্তু যেই জুড়ে দিই, দুই চোখ হয়ে ওঠে ঈষৎ কপিশ
গোল হয়ে ফুলে ওঠে হলুদ শরীর, ঝুল হয়ে
খুলে পড়ে নিরেট আঙুল

মাথা ঘাড় বুক পিঠ হাত পা বা উরু
একযোগে কেঁদে ওঠে, বিষ বিষ বিষ
ঢেলে দাও সমস্ত অগুরু– ঢালো– খোলো

খোলা হলো হাত। না, হাতে কিছু নেই
এবার তাহলে খোলো গা।

পুতুলনাচ

এই কি তবে ঠিক হলো যে দশ আঙুলের সুতোয় তুমি
ঝুলিয়ে নেবে আমায়
আর আমাকে গাইতে হবে হুকুমমতো গান?

এই কি তবে ঠিক হলো যে বৃষ্টিভেজা রথের মেলায়
সবার সামনে বলবে ডেকে, 'এসো
মরণকূপে ঝাঁপাও'?

আমার ছিল পায়ে পায়ে মুক্তি, আমার সহজ যাওয়া
এ গলি ওই গলি

আমার ছিল পথশ্রমের নিশানতোলা শহরতলি
উত্তরে-দক্ষিণে

আমার চলা ছিল আমার নিজস্ব, তাই কেউ কখনো
নেয়নি আমায় কিনে

এমন সময় তুমি আবিল হাত বাড়িয়ে যা পাও
স্বাধীনতায় দিচ্ছ গোপন টান–

এই কি তবে ঠিক হলো যে আমার মুখেও জাগিয়ে দেবে
আদিমতার নগ্ন প্রতিমান?

দল

এই খোলা দুপুরে তোমার মুখে ধরেছি বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
এই খোলা দুপুরে তোমার মুখে ধরেছি বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
আমার চোখের সামনে তোমার পতন হোক আদিম, লতাগুল্মময়

আমার চারদিকে দল মাথার ভিতরে বা ধমনীতে বিঁধে যায় দল
দু-হাতে পেষণ করি দু-চোখ বন্ধ করো বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও
তোমার শব নিয়ে বানাই দুর্গের প্রাকার

তোমাকে আদর করে তোমার শরীর ভরে জাগিয়ে দিয়েছি সব নীল ফল
এখন আমার তুমি নষ্ট হও তুমি ধ্বংস হও তুমি বিষ খাও
আমি যা বলি আজ হও তাই।

সব চুল খুলে দাও তোমার চুলে বেঁধে কণ্ঠনালি এসো ছিঁড়ে দিই
এই খোলা দুপুরে নিজের শরীরের আগুনে সব চুল জ্বেলে নাও
ধ্বংস হও তুমি চেতনাহীন হও আমার হাতে তোলা বিষ খাও

বিষের ভাঁড় তুমি খেয়ে নাও

ক্রমাগত

এইভাবে হতে থাকে ক্রমাগত
কেউ মারে কেউ মার খায়
ভিতরে সবাই খুব স্বাভাবিক কথা বলে
জ্ঞানদান করে

এই দিকে ওই দিকে তিন চার পাঁচ দিকে
টেনে নেয় গোপন আখড়ায়
কিছু-বা গলির কোণে কিছু অ্যাসফল্ট রাজপথে
সোনার ছেলেরা ছারখার

অল্প দু-চারজন বাকি থাকে যারা
তেল দেয় নিজের চরকায়
মাঝে মাঝে খড়খড়ি তুলে দেখে নেয়
বিপ্লব এসেছে কতদূর

এইভাবে, ক্রমাগত
এইভাবে, এইভাবে
ক্রমাগত

বিকেলবেলা

সারাদিনের পর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আজ বিকেলবেলা
আর স্বপ্ন দেখছি যে-স্বপ্ন দেখার কোনো কথা ছিল না আমার
যে, একটা নয় দুটো নয় তিন-তিনটে রুপোলি গোলক ঝকঝক করছে
ঢালু আকাশে
তার নিশ্বাস যতদূর পৌঁছয় ততদূরে টলে পড়ছে মানুষ।

সবার মুখ তাই থমথমে আমি জিজ্ঞেস করি ওখানে কী, কী হয়েছে ওখানে
শুনে একজন বলে ও কিছু নয়, মা বলল জলের রঙে আগুন
অনেকদিন আগে এ-রকমই হয়েছিল একবার, ঘরদুয়োর সব বন্ধ করে দাও
সেবার আর বাঁচেনি কেউ মড়কে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ।

রুপোলি আলো পারদের মতো ঘন হয়ে এগিয়ে আসে আমার মুখের ওপর
যেন জল থেকে গাঢ়তর জলে ডুবে যায় সমস্ত শরীর
কাগজে তৈরি আমার ভাইয়ের মুখ ঝুলে পড়ে কার্নিশ থেকে বাইরের হাওয়ায়
আর দেখতে দেখতে অবেলার ঘুম ভেঙে যায়, দু-চোখ ভার।

নিগ্রো বন্ধুকে চিঠি

রিচার্ড, তোমার নাম আমার শব্দের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড।
কে রিচার্ড? কেউ নয়। রিচার্ড আমার শব্দ নয়।

রিচার্ড, তোমার নাম আমার স্বপ্নের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড।
কে রিচার্ড? কেউ নয়। রিচার্ড আমার স্বপ্ন নয়।

রিচার্ড, তোমার নাম আমার দুঃখের মধ্যে আছে
রিচার্ড রিচার্ড।
কে রিচার্ড? কেউ নয়। রিচার্ড আমার দুঃখ নয়।

কলকাতা

বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না

আমারে কেউ পুছত না
কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না

কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলাপচা ভাসে

অ সোনাবৌ আমিনা
আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
কইলকাত্তায় যামু না।

বোকা

আমি খুব ভালো বেঁচে আছি
ছদ্মের সংসারে কানামাছি।

যাকে পাই তাকে ছুঁই, বলি
'কেন যাস এ-গলি ও-গলি?

বরং একবার অকপট
উদাসীন খুব হেসে ওঠ–'

শুনে ওরা বলে, 'এটা কে রে
তলে তলে চর হয়ে ফেরে?'

এমনকী সেদিনের খোকা
আঙুল নাচিয়ে বলে, 'বোকা'।

সেই থেকে বোকা হয়ে আছি
শ্যামবাজারের কাছাকাছি।

সত্য

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল যুবা
সদ্যপ্রেমে ঝাপসা, বিক্ষত।
পথের ভিড়ে মুখ লুকিয়ে কাল এক
ভিখারি তাকে বলে গিয়েছে ডেকে :
'দিনের বেলা একলা ঘুরি পথে
রাতদুপুরে সঙ্ঘে যাই ফিরে
সঙ্ঘে আমি একলা থাকি বটে
একার পথে সঙ্ঘ টের পাই।
তোর কি আছি এমন যাওয়া-আসা?
কর্মী, তোর জ্ঞানের বহু বাকি—
আমাকে তুই যা দিতে চাস ভুল
ফিরিয়ে নিই আমার ভাঙা থালা।
তা ছাড়া এই অবিমৃশ্য ঝড়ে
স্পষ্ট স্বরে বলতে চাই তোকে
সত্য থেকে সঙ্ঘ হতে পারে
সঙ্ঘ তবু পাবে না সত্যকে।'

চিতা

আজ সকাল থেকে কেউ আমাকে সত্যি কথা বলেনি
কেউ না
চিতা, জ্বলে ওঠো

সকলেরই চোখ ছিল লোভে লোভে মণিময়
মুখে ফোটে খই
চিতা, জ্বলে ওঠো

যা, পালিয়ে যা
বলতে বলতে বেঁকে যায় শরীর
চিতা

একা একা এসেছি গঙ্গায়
জ্বলে ওঠো

অথবা চণ্ডাল
দেখাও যেভাবে চাও সমীচীন ছাইমাখা নাচ।

বিরলতা

তুমি আজ এমন করে কথা বলো মনে হয় শব্দ যেন শব্দের
সন্ন্যাসিনী

নীল বনপটভূমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরস্বভাবের দিকে
দায়হীন

পাশে আছো না কি নেই বোঝা যায় না পদধ্বনি থাকা-না-থাকার খুব
মাঝখানে

কমণ্ডলু হাতে নিয়ে অনায়াসে সরে যাওয়া হাওয়ায় যেমন জল
ধ্বনিময়

টলটল চলে যায় তোমার আপন স্বর, বিরল, বিরল হ্রদে
ভাসমান

বিরলতা আনন্দের বিরলতা পূর্ণতার, তবু যদি একবার
কথা বলো।

বৃষ্টিধারা

আমার মেয়েকে নিয়ে বুকজলে
যাবার সময়ে আজ বলে যাব :
এত দম্ভ কোরো না পৃথিবী
রয়ে গেল ঘরের কাঠামো।

ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌সা করে চোখ
হাহাকার উঠেছে, তা হোক
রয়ে গেল মাটির প্রতিভা
ফিরে এসে ঠিক বুঝে নেব।
ভয় দেয় উদাসীন জল
মানুষের স্মৃতিও তরল
ঘোর রাতে আমাদেরই শুধু
বারে বারে করো ভিৎহারা?
সকলেই আছে বুকজলে
কেউ জানে কেউ বা জানে না
আমাকে যে সহজে বোঝালে
প্রণাম তোমাকে বৃষ্টিধারা।

যৌবন

দিন আর রাত্রির মাঝখানে পাখিওড়া ছায়া
মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের শেষ দেখাশোনা।

ত্যাগ

আমি খুব ভুল করে এ-রকম বৃষ্টিময় দিনে
ঘর ছেড়ে পথে যাই, পথ ছেড়ে আনন্দ নদীর
নদী চায় আরো ত্যাগ পৃথিবীর সীমানা অবধি
ধারাময় হয়ে যায় আমাদের নির্ভার জীবন
যা-কিছু কলঙ্ক ছিল শূন্যে শূন্যে ধুয়ে যায় যেন
কেবল জলের ভারে মাথা নিচু করে বলে জবা :
ও কি তবে ভুল করে ঘরের বিষাদ গেল ভুলে?

প্রেমিক

বহু অপমান নিয়ে কিছু-বা সম্মান নিয়ে আজ
শরীরসর্বস্ব হয়ে এসেছি বপনহীন নিশা–
ভোলাও ভোলাও তুমি মুছে নাও ধাতুমুখ, ক্ষত
ভোলাও শৈবাল এই ক্লীব আবরণ অপব্যয়
শব্দ নয় কথা নয় জলের ঘূর্ণিতে ব্যথা নয়
ভোলাও এ আত্মময় পাতালপ্রোথিত শল্যপাত
ভোলাও লুণ্ঠন, আমি ফিরে আসি, একবার বলো
তোমার দেবতা নেই তোমার প্রেমিক শুধু আছে!

ঠাকুরদার মঠ

এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ
চতুর্দশীর অন্ধকারে বুকের পাশে বাতি জ্বালিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি
একা
সবাই সব বুঝতে পারে কোন্ শেয়ালের কোথায় পথ পতনমুখে কীভাবে কে
হামলে দেয় গা
নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল আমার তাই এখানে চুপ করে
দাঁড়াই
সবাই আমার মুখ দেখে না আমি সবার মুখ দেখি না
তবু তোমার মঠ ছেড়ে যাই না
চতুর্দশীর অন্ধকারে তোমার বুকে আগুন দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি
একা
এইখানে চুপ করে এইখানে ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদার মঠ।

অঞ্জলি

ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়
সমস্ত মিলায়
এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা
দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে, আর জল
সব ধারে ধাবমান জল
প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন
আর, তুমি একা
এত ছোটো দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি
মহাসময়ের শূন্যতলে–

জানো না কখন দেবে কাকে দেবে কতদূরে দেবে?

রেড রোড

খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আছি ময়দানের গভীর তলদেশে
যেন নক্ষত্র তুলে নেয় আমার নিভৃত নিশ্বাস

এই অন্ধকার মণ্ডলের গহন থেকে আমার শব্দহীন স্তব
যেন পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে যায় স্বর্গীয় ঈথারে

আমাকে ভুল বুঝো না ব'লে দু-হাত ছড়িয়ে দিতে টের পাই
চোখের ঢালু বেয়ে নম্র ঘাসের মতো ক্ষীণ জলরেখা

অল্পে অল্পে প্রাণ পেয়ে কেঁপে ওঠে হাওয়ায়
জানি না বুকের কত নীচে নেমে যায় এর সর্বপায়ী শেকড়

কপালে হালকা পালক ছুঁয়ে বলে যায় রাত্রি :
এই মাটি তোমার শরীর, একে স্পর্শ করো, জানো–

আর অমনি দশ দিগন্ত ভেসে যায় উপচে পড়ে দু-চোখ
স্ফুরিত আনন্দে না কি দিশাহীন জলে

তারই পাশে রুল হাতে এগিয়ে আসে পুলিশ, বলে : ওঠো
অবৈধ তোমার এই একলা অসামাজিক শুয়ে থাকা–

আবার আমি নিচু হয়ে পায়ে পায়ে চলতে থাকি শহরের দিকে
সামনেই ঝকঝকে রেড রোড।

নির্বাসন

আমার সামনে দিয়ে যারা যায়, আমার পাশ দিয়ে যারা যায়
সবাইকে বলি : মনে রেখো

মনে রেখো একজন শারীরিক খঞ্জ হয়ে
ফিরে গিয়েছিল এই পথে

বালকের মতো তার ঘর ছিল বিষণ্ণের
দুপুর আকাশে ছন্নছাড়া

চোখে তার জল নয়, বুকের পিছনে দিঘি
ভাঙা বাড়ি প্রাচীর আড়াল

শতাব্দীর ঝুরিনামা গাছের নিবিড়ে ওই
ব্যবহারহীন জল থেকে

একজন দেখে– দূরে– কখনো দেখেনি আগে
এমন আনন্দমুগ্ধ দেশ

এমন আপনমুগ্ধ ঢল নামে, তার পাশে
এমন শরীরসঙ্গহারা

হয়তো-বা একজন ধর্মহীন বর্মহীন
নির্বাসনে যায়, মনে রেখো।

শরীর

শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে, ডাক্তার
ঠিক জানি না
কীভাবে বলতে হয় তার নাম

আয়নার সামনে বসলে ভারী হয়ে নামে চোখ
পেশির মধ্যে ব্যথা
ভিতর থেকে ফুটে বেরোয় হলুদ রঙের আলো

কিন্তু সে তো গোধূলির আভা। রক্তে কি
গোধূলি দেখা যায়?
রক্তে কি গোধূলি দেখা যায়? যাওয়া ভালো?

শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে, ডাক্তার
জানি না তার নাম।

খরা

সব নদী নালা পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে
জল ভরতে এসেছিল যারা
তারা
পাতাহারা গাছ
সামনে ঝলমল করছে বালি।

এইখানে শেষ নয়, এই সবে শুরু।
তারপর
বালি তুলে বালি তুলে বালি তুলে বালি
বালি তুলে বালি

বিশ্বসংসার এ-রকম খালি
আর কখনো মনে হয়নি আগে।

না

এর কোনো মানে নেই। একদিনের পর দু-দিন, দু-দিনের পর তিনদিন
কিন্তু তারপর কী?
একজনের পর দু-জন, সুজনের পর দুর্জন
কিন্তু তারপর কী?
এই মুখ ওই মুখ সব মুখ সমান।

তুমি বলেছিলে ঘর হবে, ঘর হলো
তারপর কী?

তুমি বলেছিলে স্নেহ হবে, স্নেহ হলো
তারপর?
কতদূরে নিতে পারে স্নেহ? অন্ধকারও আমাকে সন্দেহ
করেনি কখনো
বুকে বসে আছে তার এত বড়ো প্রতিস্পর্ধী কোনো।

না-এর পর না, না-এর পর না, না-এর পর না
তারপর কী?
পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা
তারপর?

বর্ম

'ও যখন প্রতিরাত্রে মুখে নিয়ে এক লক্ষ ক্ষত
আমার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ফিরে আসে ঘরে
দাঁড়ায় দুয়ারপ্রান্তে সমস্ত বিশ্বের স্তব্ধতায়
শরীর বাঁকিয়ে ধরে দিগন্তের থেকে শীর্ষাকাশ
আর মুখে জ্বলে থাকে লক্ষ লক্ষ তারার দাহন
অবলম্বহীন ওই গরিমার থেকে ঝুঁকে প'ড়ে
মনে হয় এই বুঝি ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন দেহ

মুহূর্তে মূর্ছিত হলো আমার পায়ের তীর্থতলে–
শূন্য থেকে শূন্যতায় নিরাকার অস্ফুট নিশ্বাস
মধ্যযামিনীর স্পন্দে শব্দহীন হলো, তখনও সে
দূর দেশে দূর কালে দূর পৃথিবীকে ডেকে বলে :
এত যদি ব্যূহ চক্র তীর তীরন্দাজ, তবে কেন
শরীর দিয়েছ শুধু বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে!'

স্পর্ধা

তার কোনো খ্যাতি নেই তার জন্মপরিচয় নেই
তার কোনো মুক্তি নেই লোকে যাকে মুক্তি বলে থাকে
যতদূর দেখা যায় সারি সারি কম্বল, পশম
আর কোনো ঢেউ নেই ঢেউয়ের সংঘর্ষে দ্যুতি নেই।
জীবন এত যে ভালো, সে-জীবনে অধিকার নেই
লজ্জাহীন সুন্দরের মুখে কোনো ম্লান আভা নেই
সারি সারি উট আর উটের চোখের নীচে জল
দু-হাত বাড়িয়ে দেখে আর কোনো জলচিহ্ন নেই–
তবু সে এমনভাবে কোন্ স্পর্ধা করে বলে যায়
'আমার দুঃখের কাছে তোমাদের নত হতে হবে!'

সন্ততি

আবার ফিরে আসে এ-রকম নিজের মধ্যে ভরে-ওঠা দুপুর
যখন মাথার উপর নিকষকালো মেঘ
আর অগাধ পাটখেতের কিনার ঘিরে আমাদের নিঃশব্দ চলা

ছমছমে প্রান্তর জুড়ে খেলনা দুই মানুষ
ভেসে ওঠে সুখে-দুঃখে অস্পষ্ট অতীত দিন নিয়ে
ভয়ে ভয়ে সরে আসে শস্যের পাশাপাশি খুব

কেননা এই সুখ এই দুঃখ এই আকাশ
আমাদের ছিঁড়ে নেয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যথাময়
গ্রামান্তের দিকে

শুধু ধরা থাকে হাত
হাতে হাতে কথা নেই কোনো
চোখে চোখ রাখি তবু কেউ কাউকে দেখতে পাই না আর

এ কি মৃত্যু? এ কি বিচ্ছেদ? না কি মিলনেরই অপার বিস্তার?
এ কি মুহূর্ত? এ কি অনন্ত? না কি এরই নাম সন্তত জীবন?

আমাদের মাঝখানে প্রথম বৃষ্টির বিন্দু নীল
আর তুমি নিচু হয়ে তুলে নাও একমুঠো মাটি

শূন্যে ছড়াও, আর চোখে চোখে না তাকিয়ে বলো :
ভেবো না। ভেবো না কিছু! দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রতিভা

ক্রমে এনে দেব তোকে স্ফীত মুণ্ড, স্নায়ুহীন ধড়
থাবায় লুকোনো বহু বাঘনখ, লোমশ কাকুতি
চোখের প্রতিটি পক্ষ্মে এনে দেব ধূর্ত শলাকা-র
ক্ষিপ্র চলাচল, আর, জল নয়, লালা দুই চোখে।
হৃৎপিণ্ডে বেঁধে দেব কারুকার্যে পাথরের ঢাল
মেরুদণ্ডে গলে-যাওয়া সরীসৃপ-আভা, আর স্বরে
সহজে বাজিয়ে দেব নবমীর ন-হাজার ঢাক–
তারপরে বলে দেব– আ, এই প্রতিভা আমার,
যা, শহরের পথে অকাতরে ঘোর এইবার।

শাদাকালো

পথের ওই খুনখুনে বুড়ো
যখন এগিয়ে এসে বলে 'আমি চাই।
দেবেন না? না দিয়ে
কাকে ঠকাচ্ছেন মশাই?'
আর চারদিক থেকে ভদ্রলোকেরা :
'সাবধান, সরে যান
লোকটা নির্ঘাৎ টেনে এসেছে
কয়েক পাঁইট'

তখন আমার সামনে কেঁপে দাঁড়ায়
ওয়াশিংটনের আরেক মস্ত বুড়ো
থুত্থুরে
ছেঁড়া বুকে ঢিল খেতে খেতে
তবু যে আঙুল তুলে বলেছিল 'শোনো
আই অ্যাম ব্ল্যাক
ও ইয়েস, আই অ্যাম ব্ল্যাক
বাট্ মাই ওয়াইফ ইজ হোয়াইট!'

হাসপাতাল

নার্স ১

ঘুমোতে পারি না, প্রতি হাড়ের ভিতরে জমে ঘুণ
পা থেকে মাথায় ওঠে অশালীন বীজাণুবিস্তার
ঘূর্ণমান ডাক দিই : কে কোথায়, সিস্টার সিস্টার–

'হয়েছে কী? চুপ করে নিরিবিলি ঘুমিয়ে থাকুন।
তাছাড়া নিয়মমতো খেয়ে যান ফলের নির্যাস–'
শাদাঝুঁটি লাল বেল্ট খুট খুট ফিরে যায় নার্স।

নার্স ২

রাত দুটো। চুপিচুপি দুটি মেয়ে ঢুকে দেখে পাশের কেবিনে
ম্রিয়মাণ যুবাটির আরো কিছু মরা হলো কি না।

'এখনও ততটা নয়' ঠোঁট টিপে এ ওকে জানায়।
'তবে কি ঘুমোচ্ছে? না কি জ্ঞানহীন? ডাক্তার দরকার?'

'থাক বাপু'– ফিনফিনে ফিঙে দুটি ফিরে চলে যায়
'আমরা কী করতে পারি! যার যার ঈশ্বর সহায়!'

নার্স ৩

দু-জন আছেন ওই অ্যাপ্রনসুন্দরী
অ্যাপ্রনের নীচে রেখে হাসি
মুখে মরুভূমি নিয়ে নিয়মিত ভোরে
বিছানা সাজান বারো মাসই
যদি বলি 'চাদরের আমিও কোণ ধরি'
আমাকে দেবেন ঠিক ফাঁসি!

নার্স ৪

হাসিও ছিল বারণ
মুখে তাকাই না, কারণ
তাকালে মুখে রোগীর বুকে
রক্ত-সমুৎসারণ।

ধরেছি বটে নাড়ি,
কপাল ছুঁতে কি পারি?
এক ঝাপট্-এ মাথায় ওঠে
ছেলে থেকে বুড়ো ধাড়ি।

পায়ের নীচে একটুকরো খাবার

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

ঠোঁটের থেকে পড়ছে ঝরে ঝরে–
অন্য ধারে গিয়ে খাবার খা না!

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

খুব বিরক্ত করছিল কি তোকে?
বড়োই বেশি করছিল বাহানা?

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

দিস নি, ভালো, দিলেই হতো ভুল
লোভ বাড়াতে শাস্ত্রে আছে মানা।

পায়ের তলায় কুড়িয়ে নেয় দানা।

তোর দয়াতে হয়তো পেত ভয়
চেঁচিয়ে উঠে বলত 'না-না, না-না'

বিস্ফোরণে ফাটত হঠাৎ দানা
বাংলা থেকে কিউবা থেকে ঘানা।

বাবুমশাই

আশা করি সকলেই বুঝবেন যে এই ধরণের
রচনা পড়বার বিশেষ একটা সুর আছে।

'সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা!
বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তাছাড়া ভাই

আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা

যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নিচু জনে'
—কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশয়

মিত্র বাবুমশয় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই,
মাঝেমধ্যে ভাবেন তাদের নুন আনতে পান্তাই
নিত্য ফুরোয় যাদের

'নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলার কুকুর
সেটা হয় না বাবা

সেটা হয় না বাবা' বলেই থাবা বাড়ান যতেক বাবু
কার ভাগে কী কম পড়ে যায় ভাবতে থাকেন ভাবুক
অমনি দু-চোখ বেয়ে

অমনি দু-চোখ বেয়ে অলপ্পেয়ে ঝরে জলের ধারা
বলেন বাবু 'হা, বিপ্লবের সব মাটি সাহারা'
কুমির কাঁদতে থাকে

কুমির কাঁদতে থাকে 'আয় আমাকে নামা নামা' ব'লে
কিন্তু বাপু আর যাব না চরাতে-জঙ্গলে
আমরা ঢের বুঝেছি

আমরা ঢের বুঝেছি খেঁদিপেঁচি নামের এসব আদর
সামনে গেলেই ভরবে মুখে, প্রাণ ভরে তাই সাধো
তুমি সে-বন্ধু না

তুমি সে-বন্ধু না, যে-ধূপধুনা জ্বলে হাজার চোখে
দেখতে পাবে তাকে, সে কি যেমনতেমন লোক

তাই সব অমাত্য

তাই সব অমাত্য পাত্রমিত্র এই বিলাপে খুশি
'শুঁড়িখানাই কেবল সত্য, আর তো সবই ভূষি
ছি ছি হায় বেচারা!'

ছি ছি হায় বেচারা? শুনুন যাঁরা মস্ত পরিত্রাতা
এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা
হেঁটে দেখতে শিখুন

হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়
সাহেব বাবুমশায়!

পাগল হবার আগে

ফুলবেলপাতা ড্যাডাং ড্যাং
ঘনকাসুন্দি ড্যাডাং ড্যাং
দিন যদি তার চোখ শুষে নেয়
রাত্রিবেলার মাথায় ব্যাং।

ছাপোষা ছাপ্পা ধে ধে রে খাপ্পা
বুঝে গিয়েছি হে বেবাক ধাপ্পা
মাথার ভিতরে উলটে গিয়েছে
তিনচারজোড়া গোরুর ঠ্যাং

কাটা-কাট্-কাট্ আরে আকাট
এই ডান-কাৎ এই বাঁ-কাৎ
দিনদুপুরে-যে সবই ডাকাত
জবর গ্যাং!

ফুলবেলপাতা ড্যাডাং ড্যাং
ঘনকাসুন্দি ড্যাডাং ড্যাং
ছড়িয়ে গিয়েছে আসল গ্যাং
অহো রে শহরে গ্যাঙরগ্যাঙ।

এই শহরের রাখাল

গোরুর পিঠে উঠবে বলে দৌড়েছিল যুবা
খোলা পথের উপর
লোকে বলল পাগল, লোকে বুঝেও নিল মাতাল
তা বলে...ভরদুপুর...?

দুপুরবেলাই? বাঁধো ওকে! মাথায় ঢালো জল
হাতে পরাও বেড়ি!
'বেড়ি? না কি রুপোর মালা?' ব'লে যুবক সবার
ঠিক করে দেয় টেরি।

ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল সবাই 'এইরকমই হবে,
আকাল, মশাই, আকাল।'
গোরুর পিঠে দাঁড়িয়ে যুবা বলে 'এবার আমিই
এই শহরের রাখাল।'

ঘরে ফেরার রাত

দেখেছি পথে যেতে, চলেছে হামা দিয়ে
বৈধাবৈধের লক্ষ চুম্বন
মিলেছে শহরের মুক্ত নাভিতটে
লুব্ধ পাঁচ মাথা : নষ্ট চুম্বন
মানুষ নামে ওঠে মানুষ মাঝখানে

দশটা পাঁচটার ত্রস্ত চুম্বন
কেবিনে পর্দায় গভীর ময়দানে
মুখ না মুখোশের শুষ্ক চুম্বন
এখানে কফি হাতে ওখানে জটলায়
বামন চায় চাঁদে খুচরো চুম্বন
এ-ওকে ধ্বংসের ভিতরে উত্থান
কর্তৃপদে তাই তুখোড় চুম্বন
হঠাৎ-পতনের শায়িত খোলা বুকে
জনতা তোলে খর নখর, চুম্বন
'থামাও, বাঁধো, ধাও' ধ্বনির গহ্বরে
লরি ও ট্যাক্সির প্রখর চুম্বন

শরীর ফেরে তবু, যদিও কৃকলাশ,
চোখের পাতা চায় চোখের চুম্বন।

তিমির বিষয়ে দু-টুকরো

আন্দোলন

ময়দান ভারী হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।

নিহত ছেলের মা

আকাশ ভরে যায় ভস্মে
  দেবতাদের অভিমান এইরকম
আর আমাদের বুক থেকে চরাচরব্যাপী কালো হাওয়ার উত্থান
এ ছাড়া
আর কোনো শান্তি নেই কোনো অশান্তিও না।

বড়ো বেশি দেখা হলো

বড়ো বেশি দেখা হলো যা-দেখার পাপে শরীরের
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে যায় ত্রাণহীন নীরন্ধ্র কালিমা।
যদিই বাঁচাতে চাও দুই চোখে ঘষে দাও তুঁতে
চোখের তারায় দাও তরবারি উদ্দাম লবণ
জ্বালাও গন্ধক ধূম হলাহল ধ্বংস করে দাও
চেতনা চৈতন্য বোধ লুপ্ত করো অনুভব স্বাদ
শিরায় ছড়াও আর্দ্র ধারাময় সরীসৃপ দাহ
কটাহে ঘোরাও দণ্ড অক্ষিপট ঝিল্লি কনীনিকা
ছিন্ন করে নাও ছিন্ন অন্ধ করে দাও দুই চোখ
বড়ো বেশি দেখা হলো ধর্মত যা দেখা অপরাধ!

তুমি

আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই
তুমি আছো তুমি।

গঙ্গাযমুনা

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
আর সবই থামা থেমে-যাওয়া চোয়ালে-চোয়াল-জাগা উচ্চাশার ঝুল লাগা
নেমে যাওয়া ভাঙা বর্ষার প্লাবনশেষে ম্যানহোল থেকে তোলা অস্ত্রময়
ভয় আর ধ্বস্তদেহ ফেলে রেখে ছুটে যাওয়া টায়ার টায়ার
ব্রিজ ধ্বস্
আর সবই শহরের কবিতা, কেবল এইটে প্রান্তরের।

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
এইটে উপচেপড়া পূর্ণ টান সমুদ্রের কী কী যেন বাকি ছিল ব্যথা দেওয়া হলো
কাকে অকারণে একদিন হাঁটুজল ভেঙে চলে যাওয়া বসন্তের উড়ো চুল
হাসাহাসি করে লোকে নিচু হয়ে বুকে নেওয়া সমস্ত পথের ধুলো
হাজার হাজার পাতা উড়ে যাওয়া আসন্ন ঈশান
আর সবই গঙ্গার কবিতা, কেবল এইটে যমুনার।

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জ্বেলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে
বসে থাকি?

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পরে নিই
মানবশরীর একবার?

দ্রাবিত সময় ঘরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে-ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো?

যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো। চতুরতা, যাও।
কী-বা আসে যায়

লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয়।

হওয়া

হলে হলো, না হলে নেই।
এইভাবেই
জীবনটাকে রেখো
তাছাড়া, কিছু শেখো
পথেবসানো ওই
উলঙ্গিনী ভিখারিনীর
দু-চোখে ধীর
প্রতিবাদের কাছে

আছে, এসবও আছে।

বাজি

সন্ন্যাসী হয়েছ সবটুকু?
সবটুকু।
ছেড়ে দিতে পারো সব? রাজি?
রাজি।
উপেক্ষা কি উপেক্ষা দিয়েই
সহজে ফেরাতে পারো মুলে?
খুলে
দিয়েছ সমস্ত দ্বার? আর
নিহিত শীতের রাত্রে তালবীথি দেখেছে আগুন
ওই স্বচ্ছ জলে?
তবে এসো, এইবার, সবটুকু ধরো, দাও টান
মনে রেখো কিছুতেই কোথাও তোমার কোনো ত্রাণ
নেই
জিতে গেছ বাজি।

ধর্ম

শুয়ে আছি শ্মশানে। ওদের বলো
চিতা সাজাবার সময়ে
এত বেশি হল্লা ভালো নয়।

মাথার উপরে পায়ের নীচে হাতের পাশে ওরা
সবাই তোমার বান্দা
ওদের বলো

বলো যে এই শূন্য আমার বুকের উপর দাঁড়াক
খুলুক তার গুল্‌ফ-ছোঁয়া চুল
মুকুটভরা জ্বলে উঠুক তারা। ওরা পালাক

আর, নাম-না-জানা মুণ্ডমালা থেকে
ঝরে পড়ুক, ধর্ম ঝরে পড়ুক
ঠান্ডা মুখে, আমার ঠান্ডা বুকে, ঠান্ডা!

সঙ্গিনী

হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়
এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।

পায়ের ভিতর মাতাল, আমার পায়ের নীচে
মাতাল, এই মদের কাছে সবাই ঋণী
ঝলমলে ঘোর দুপুরবেলাও সঙ্গে থাকে
হাঁ-করা ওই গঙ্গাতীরের চণ্ডালিনী।

সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়।

মানে

কোনো-যে মানে নেই, এটাই মানে।
বন্য শূকরী কি নিজেকে জানে?
বাঁচার চেয়ে বেশি বাঁচে না প্রাণে।

শকুন, এসেছিস কী-সন্ধানে?
এই নে বুক মুখ, হাত নে পা নে–
ভাবিস পাবি তবু আমার মানে?

অন্ধ চোখ থেকে বধির কানে
ছোটে যে বিদ্যুৎ, সেটাই মানে।
থাকার চেয়ে বেশি থাকে না প্রাণে।

ছুটেছে উন্মাদ, এখনও ত্রাণে
রেখেছে নির্ভয়, সহজযানে
ভাবে সে পেয়ে যাবে জীবনে মানে!

বিভোর মাথা কেউ খুঁড়েছে শানে
কিছু-বা ভীরু হাত আফিম আনে–
জানে না বাঁচে কোন্ বীজাণুপানে :

কোনো-যে মানে নেই সেটাই মানে।

কোনো-যে মানে নেই সেটাই মানে।

ধ্বংস করো ধ্বজা

আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
এখনই
বলতে চাই, চুপ

তবু
বলতে পারি না। আর তাই
নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।

বলতে চাই, জানি
জানি যে আমার মজ্জার মধ্য দিয়ে তোমার
ঘিরে ঘিরে পাক দেওয়া টান

বলতে চাই তোমার শেষ নেই তোমার শুরু নেই, কেবল জল, লবণ
তোমার চোখ নেই স্নায়ু নেই
শুধু কুসুম

শুধু পরাগ, আবর্তন, শুধু ঘূর্ণি
শুধু গহ্বর
বলতে চাই, নিপাত যাও– ধ্বংস হও– ভাঙো

কিন্তু বলতে পারি না, কেননা তার আগেই
তুমি নিজে
নিজের হাতে ধ্বংস করো আমার ধ্বজা, আমার আত্মা।

পুরোনো গাছের গুঁড়ি

ছিল-বা হাসির চপলতা। পানপাতা যেন
মুছে নেয় গাল

এমনই সবুজ আভা মুখে
মনে হয়েছিল এত অনাদরে তবুও সজল

স্নেহশাখা, পাতায় পাতায় ক্রীড়াময়, কথা বলা
শিরায় শিরায়

দুধারে ছড়ানো এই প্রণতি ও উত্থান, মনে হয়েছিল
তুমি আছো, আছো তুমি। তবু

চোখ যদি ফিরে আসে মূলে
খুলে যায় রজনীর নীল

নিচু হয়ে বলি :
পুরোনো গাছের গুঁড়ি, বাকলে ধরেছ কত ঘুণ?

সেদিন অনন্ত মধ্যরাত

বৃষ্টি হয়েছিল পথে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে
বাসা ভেঙে গিয়েছিল, গাছগুলি পেয়েছিল হাওয়া
সুপুরিডানার শীর্ষে রুপোলি জলের প্রভা ছিল

আর ছিল অন্ধকারে– হৃদয়রহিত অন্ধকারে
মাটিতে শোয়ানো নৌকো, বৃষ্টি জমে ছিল তার বুকে
ভেজা বাকলের শ্বাস শূন্যের ভিতরে স্তব্ধ ছিল

মাটি ও আকাশ শুধু সেতু হয়ে বেঁধেছিল ধারা
জীবনমৃত্যুর ঠিক মাঝখানে বায়বীয় জাল
কাঁপিয়ে নামিয়েছিল অতীত, অভাব, অবসাদ

পাথরপ্রতিমা তাই পাথরে রেখেছে শাদা মুখ
আর তার চারধারে ঝরে পড়ে বৃষ্টি অবিরল
বৃষ্টি নয়, বিন্দুগুলি শেফালি টগর গন্ধরাজ

মুছে নিতে চায় তার জীবনের শেষ অপমান
বাসাহীন শরীরের উড়ে-যাওয়া ম্লান ইশারাতে
বৃষ্টি হয়েছিল বুকে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে।

মণিকর্ণিকা

চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যায় গঙ্গা
তার ওপরে আমাদের পলকা নৌকোর নিশ্বাস
মুখে এসে লাগে মণিকর্ণিকার আভা

আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না
হাতে শুধু ছুঁয়ে থাকি পাটাতন
আর দু-এক ফোঁটা জলের তিলক লাগে কপালে

দিনের বেলা যাকে দেখেছিলে চণ্ডাল
আর রাত্রিবেলা এই আমাদের মাঝি
কোনো ভেদ নেই এদের চোখের তারায়

জলের ওপর উড়ে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ
বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে ভস্ম
পাঁজরের মধ্যে ডুব দিচ্ছে শুশুক

এবার আমরা ঘুরিয়ে নেব নৌকো
দক্ষিণে ওই হরিশ্চন্দ্রের ঘাট
দুদিকেই দেখা যায় কালুডোমের ঘর

চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যায় গঙ্গা
এক শ্মশান থেকে আরেক শ্মশানের মাঝখানে
আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না।

জীবনবন্দী

করুণা চেয়েছি ভাবো? তোমাদের সমর্থন? ভুল।
অনুমোদনের জন্য হৃদয়ে অপেক্ষা নেই আর।
সে জানে ভুলের মাত্রা, সে জানে ধ্বংসের সব সূচি,
এ হাতে ছুঁলে সে জানে ভস্ম হয়ে যাবে ওই মুখ।
কার কাছে কথা তবে? কারো কাছে নয়। এ কেবল
যেভাবে জীবনবন্দী বুকচাপা কুঠুরিতে ব'সে
দিনের রাতের চিহ্ন এঁকে রাখে দেয়ালের গায়ে
সেইমতো দিন গোনা রাত জাগা মাথা খুঁড়ে যাওয়া
লোহাতে লোহার ধ্বনি জাগানো, বাজানো, বিফলতা।
যে দেখে সে দেখে শুধু একজন খুলে দিয়ে চুল
সবারই পাঁজর চেপে দাঁড়িয়েছে লোল রসনায়
এ কেবল তারই নাচ বলয়ে বলয়ে বুনে যাওয়া—
ভালো যদি বলো একে ভালো তবে, না বলো তো নয়।

তক্ষক

তোমার কোনো বন্ধু নেই তোমার কোনো বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোনো ভিত্তি নেই তোমার কোনো শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক
তোমার কোনো নৌকো নেই তোমার কোনো বৈঠা নেই
কেবল ব্যাপ্তি
তোমার কোনো উৎস নেই তোমার কোনো ক্ষান্তি নেই
কেবল ছন্দ

তোমার শুধু জাগরণ শুধু উত্থাপন কেবল উদ্‌ভিদ
তোমার শুধু পাম্মা আর শুধু বিচ্ছুরণ কেবল শক্তি।

তোমার কোনো মিথ্যা নেই তোমার কোনো সত্য নেই
কেবল দংশন

তোমার কোনো ভিত্তি নেই তোমার কোনো শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক
তোমার কোনো বন্ধু নেই তোমার কোনো বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোনো দৃষ্টি নেই তোমার কোনো শ্রুতি নেই
কেবল সত্তা।

বাবরের প্রার্থনা

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত–
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান ;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝল্‌সানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

শূন্যের ভিতরে ঢেউ

বলিনি কখনো?
আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে।

এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে
সেই এক বলা

কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড়ো
কোনো ভাষা নেই

কেননা শরীর তার দেহহীন উত্থানে জেগে
যতদূর মুছে নিতে জানে

দীর্ঘ চরাচর,
তার চেয়ে আর কোনো দীর্ঘতর যবনিকা নেই।

কেননা পড়ন্ত ফুল, চিতার রুপালি ছাই, ধাবমান শেষ ট্রাম
সকলেই চেয়েছে আশ্রয়

সেকথা বলিনি? তবে কী ভাবে তাকাল এতদিন
জলের কিনারে নিচু জবা?

শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে
সেকথা জানে না?

মনকে বলো 'না'

এবার তবে খুলে দেওয়া, সব বাঁধনই আলগা করে নেওয়া
যখন বলি, কেমন আছো? ভালো?
'ভালো' বলেই মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন মরুভূমি
এবার তবে ছিন্ন করে যাওয়া।

বন্ধ ছিল সদর, তোমার চোখ ছিল যে পাথর
সেসব কথা আজ ভাবি না আর
যাওয়ার পরে যাওয়া কেবল যাওয়া এবং যাওয়ায়
আকাশ গন্ধরাজ।

শিরায় শিরায় অভিমানের ঝর্না ভেঙে নামে
দুই চোখই চায় গঙ্গাযমুনা
মন কি আজও লালন চায়? মনকে বলো 'না'
মনকে বলো 'না', বলো 'না'।

কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

আমারই বুক থেকে ঝলক
পলাশ ছুটছিল সেদিন

লোকেরও লাগছিল ভালো—
লোকের ভালো লাগছিল।

লোকে কি জেনেছিল সেদিন
এখনও বাকি আছে আর কে?

আসলে ভেবেছিল সবই
উদাস প্রকৃতির ছবি।

তবু তো দেখো আজও ঝরি
কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

তোমারই সেন্ট্রাল জেলে,
তোমারই কার্জন পার্কে!

হাসপাতালে বলির বাজনা

আমার ভাই ছিল ফেরার, আমার মাসিমা যখন মারা যান।
চারদিকে ছুটছিল বাজি, কালীপুজোর রাত। হাসপাতালের
বারান্দাও কেঁপে উঠছিল আনন্দে।
তালে তালে জাগছিল হিক্কা, শেষ সময়ের নিশ্বাস। হয়তো
এবার শুনতে পাব : রঞ্জন রঞ্জন
বেজে উঠল ঢাক, হাজার কাঠির ঝনৎকার। আমরা সবাই নিচু
হয়ে কান নিয়েছি কাছে
ঠোঁটের ভিতর ফেনিল ঢেউ : এল, ওই এল ওদের নিশান,
আমায় ছাড়্। তুবড়ি ওঠে জ্ব'লে।
আমরা সবাই বলেছিলাম : শেষ সময়ের প্রলাপ।
হাসপাতালে বলির বাজনা। ভাই ছিল ফেরার।

চাপ সৃষ্টি করুন

ঝরে যাবেন? ঝরুন
ঝরুন দাদা, ঝরুন!
ভিতরদিকে আছেন যাঁরা
একটু মশাই নড়ুন—
চাপ সৃষ্টি করুন!
চাপ সৃষ্টি করুন!

হঠাৎ ঝাঁপে উলটে যাবেন
শক্ত হাতে ধরুন
খুব যে খুশি পা-দানিতেই
কেইবা চায় দুঃখ নিতে–
যা পেয়েছেন দেখুন ভেবে
নাক না ওটা, নরুন।

একটু মশাই নড়ুন
ভিতর থেকে নড়ুন
চাপ সৃষ্টি করুন
চাপ সৃষ্টি করুন।

'মার্চিং সং'

সুন্দরী লো সুন্দরী
কোন্ মুখে তোর গুণ ধরি
দিব্যি সোনার মুখ করে তুই
দুই বেলা যা খাস
ঘাস বিচালি ঘাস।

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস
কিন্তু মুখে জ্বলবে আলো
পদ্মাভসংকাশ
নেই কোনো সন্ত্রাস।

নেই কোনো সন্ত্রাস
ত্রাস যদি কেউ বলিস তাদের
ঘটবে সর্বনাশ–
ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস!

রাধাচূড়া

মালী বলেছিল। সেইমতো
টবে লাগিয়েছি রাধাচূড়া।
এতটুকু টবে এতটা গাছ?
সে কি হতে পারে? মালী বলে
হতে পারে যদি ঠিক জানো
কীভাবে বানায় গাছপালা।

খুব যদি বাড় বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠান্ডা চুপ–
ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
লোকেও বলবে রাধাচূড়া।

সবই বলেছিল ঠিক, শুধু
মালী যা বলেনি সেটা হলো
সেই বাড় নীচে চারিয়ে যায়
শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে, আর
এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে
হয়ে ওঠে এক অন্য গাছ।

এমনকী সেই মরশুমি টব
ইতস্তেতর চোরা টানে
বড়ো মাথা ছেড়ে ছোটো মাথায়
কাতারে কাতারে ঝেঁপে আসায়
ফেটে যেতে পারে হঠাৎ যে
সেকথা কি মালী বলেছিল?

মালী তা বলেনি, রাধাচূড়া!

'আপাতত শান্তিকল্যাণ'

পেটের কাছে উঁচিয়ে আছো ছুরি
কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি
এখন সবই শান্ত, সবই ভালো।
তরল আগুন ভরে পাকস্থলী
যে-কথাটাই বলাতে চাও বলি
সত্য এবার হয়েছে জমকালো।

গলায় যদি ঝুলিয়ে দাও পাথর
হালকা হাওয়ার গন্ধ সে তো আতর
তাই নিয়ে যাই অবাধ জলস্রোতে–
সবাই বলে, হা হা রে রঙ্গিলা
জলের উপর ভাসে কেমন শিলা
শূন্যে দেখো নৌকো ভেসে ওঠে।

এখন সবই শান্ত সবই ভালো
সত্য এবার হয়েছে জমকালো
বজ্র থেকে পাঁজর গেছে খুলে
এ-দুই চোখে দেখতে দিন বা না দিন
আমরা সবাই ব্যক্তি এবং স্বাধীন
আকাশ থেকে ঝোলা গাছের মূলে।

বিকল্প

নিশান বদল হলো হঠাৎ সকালে
ধ্বনি শুধু থেকে গেল, থেকে গেল বাণী
আমি যা ছিলাম তাই থেকে গেছি আজও
একই মতো থেকে যায় গ্রাম রাজধানী

কোনো মাথা নামে আর কোনো মাথা ওঠে
কথা ছুঁড়ে দিয়ে যায় সারসের ঠোঁটে।

আমার গাঁয়েই না কি এসেছিল রাজা
কখনো দেখিনি এত শালু বা আতর
নিচু হয়ে আঁজলায় চেয়েছি বাতাস
রাজা হেসে বলে যায় : ভালো হোক তোর।

কথা তবু থেকে যায় কথার মনেই
কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই!

হাতেমতাই

হাতের কাছে ছিল হাতেমতাই
চুড়োয় বসিয়েছি তাকে
দু-হাত জোড় করে বলেছি 'প্রভু
দিয়েছি খত দেখো নাকে।
এবার যদি চাও গলাও দেব
দেখি না বরাতে যা থাকে—
আমার বাঁচামরা তোমারই হাতে
স্মরণে রেখো বান্দাকে!'

ডুমুরপাতা আজও কোমরে ঝোলে
লজ্জা বাকি আছে কিছু
এটাই লজ্জার। এখনও মজ্জার
ভিতরে এত আগুপিছু!
এবার সব খুলে চরণমূলে
ঝাঁপাব ডাঁই-করা পাঁকে
এবং মিলে যাব যেমন সহজই
চৈত্র মেশে বৈশাখে।

মনোহরপুকুর

শহর তার বুকের থেকে খুলে দিয়েছে ঢাল
অরক্ষিত যে-কোনো দিকে ছুটেছে মানুষেরা
এক নিমেষে মিশে গিয়েছে তরঙ্গ ও ত্রাস

গলির মুখে খুলে গিয়েছে সুড়ঙ্গের ডালা
হাজার হাত ছড়িয়ে আছে অকালভৈরবী
এ চোখে যদি অসুর তার অন্য চোখে সুরা

অগস্ত্যের চুমুক শুষে নিয়েছে সব জল
পাতাল ছিঁড়ে জেগেছে যত মাছের মৃতদেহ
মাথার থেকে মাথায় ছোটে বিদ্যুতের শিরা

দিনদুপুরে নিলামডাকে বিকিয়ে গেছে পাড়া
আমিও শুধু একলা বসে মনোহরপুকুরে
ছিপ করেছি নিজের হাতে নিজেরই শিরদাঁড়া!

নচিকেতা

দিয়ে যেতে হবে আজ এই দুই চোখ
ঘ্রাণ শ্রুতি স্পর্শ সব দিয়ে যেতে হবে।
উঠোনে দোপাটি হাওয়া স্মৃতি ও ডালিম
মাঠের পথিক শ্রান্তি দিগন্তদুপুর
কিছু উজ্জীবন কিছু হাহাকার আর
দিয়ে যেতে হবে সব সেতুহীন দিন।
গাভীর শরীরে দ্যুতি অন্ধকারে হীরা
দিয়ে যেতে হবে সব বিচালি ও খড়
নিবন্ত মশাল আর ভিটে মাচা ঘর
যা কিছু করেছি আর করিওনি যত
এবার যজ্ঞের শেষে দিতে হবে সব।

এবার নিভৃত এই অপমানে শোকে
যে-কটি অন্তিম জবা উঠেছিল জ্বলে
আগুনে ঝরিয়ে দিতে হবে। আর তোকে
যমের দক্ষিণ হাতে দিতে হবে আজ
চায় তোকে দৃষ্টিহীন বধির সমাজ!

অর্কেস্ট্রা

ভোর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনও।

স্থির অমাবস্যা, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি দিগন্তের ধারে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে
আমার শরীর যেন আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে।

বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর আর তালে তালে নাচে সেই হাত
গ্রহনক্ষত্রের দল ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে।
স্তূপ হয়ে অন্ধকারে সোনারঙা সুর ওই ওঠে আর উঠে ঝরে পড়ে।

সেই সুরে খুলে যায় নামহারা গহ্বরের মৃতদেহগুলি
পিছনে অলীক হাতে তালি।
অবসন্ন ফিরে দেখি ঘাসের উপরে শুয়ে আছে

পুরোনো বন্ধুর দল
শিশির মাখানো শান্ত প্রসারিত হাতগুলি বাঁকা।

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ

১

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ

জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।

২
ঝড়ে-ভাঙা লাইটপোস্ট একা পড়ে আছে ধানখেতে
শিয়রে জোনাকি, শূন্যে কালপুরুষের তরবারি
যুদ্ধ হয়ে গেছে শেষ, নিঃশব্দ প্রহর দশ দিকে
যেদিকে তাকাও রাত্রি প্রকাণ্ড নিকষ সরোবর।

৪
চোখের পাতায় এসে হাত রাখে শ্লথ বেলপাতা
পাকা ধান নুয়ে প'ড়ে আদরে ঘিরেছে শরীরীকে
বালির গভীর তলে ঘন হয়ে বসে আছে জল
এখানে ঘুমোনো এত সনাতন, জেগে ওঠা, তাও।

৫
ভাসন্ত শবের মুখে বসেছিল দক্ষিণের পাখি
সূর্যের অন্তিম হাত মুছে দিয়েছিল দুঃখরেখা
পলিতে পলিতে দেশ ছেয়ে যাক! যায়নি এখনও?
ভাসন্ত শবের পাখি সূর্যের কুহরে উড়ে যায়।

৬
আর্তনাদ করে ওঠে, দুহাত বাড়িয়ে বলে : এসো
এসো সর্বনাশে এসো আগ্নেয় গুহায় এসো বোধে
এসো ঘূর্ণিপাকে বীজে অন্ধের ছোঁয়ায় এসো এসো
শিকড়ে গরল ঢেলে শিখরে জাগিয়ে দেব জ্বালা।

৮
ঘরবাড়ি ভিজে যায় অশান্ত ধানের মাঝখানে।
রবিউল ব'সে দেখে। এ রকমই মীড় বা গমকে
ভরে ছিল সময়ের স্তরগুলি একদিন, আজ
বাজনা রয়েছে পড়ে, ফিরে গেছে বাজাবার হাত।

১১
এইসব লেখা তার মানে খুঁজে পাবে বলে আসে
শহরের শেষ ধাপে কবরসারির পাশাপাশি
এপিটাফগুলি তার অভিধা বাড়ায় সন্ধ্যাবেলা
নগ্ন অক্ষরের গায়ে মৃত বন্ধুদের হিম শ্বাসে।

১৩
আমি আছি, এই শুধু। আমার কি কথা ছিল কোনো?
যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি
কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব ব'লে
এই দুই অন্ধ চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।

১৬
ওই স্নেহময় মুখে যখন রেখেছি দুই-হাত
তরুণ সবুজ পাতা স্মৃতিতে বুলায় মর্মরতা
বেঁচে যে ছিলাম তার বিরলতা জল হয়ে নামে
হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় পিছে পড়ে-থাকা সব মান।

২৪
'নদী খুব নদী নয়, ভেজায় পায়ের মূল, পাতা
প্রেম তত প্রেম নয়, ঘিরে আছে সীমানা কেবল
শ্মশানও তেমন ধুনি সাধনার বিশালতা নয়
রাত্রি শুধু বীজময়, ভোর শুধু ভোরের বাগিচা।

৩০
এই উষ্ণ ধানখেতে শরীর প্রাসাদ হয়ে যায়
প্রতিটি মুহূর্ত যেন লেগে থাকে প্রাচীন স্ফটিক
সীমান্ত পেরিয়ে যেই পার হই প্রথম খিলান
ঘর থেকে ঘর আর হাজার দুয়ার যায় খুলে।

৩১
পদক্ষেপে পদক্ষেপে এক অক্ষৌহিণী বৃষ্টিরেখা
স্তব্ধ বসতির দিকে ধেয়ে আসে প্রান্তর পেরিয়ে
প্রস্তুত ছিল না রথ, ঢালবর্ম দূরে, পড়ে আছি
খোলা দশ দিগন্তের মাঝখানে স্নিগ্ধ পরাভূত।

৩২
মজ্জায় মজ্জায় তার আলস্যমথিত অন্ধকারে
জেগে ওঠে দীর্ঘ শাল আজানুলম্বিত বটঝুরি
সন্ন্যাসী জ্বালায় চুল্লি দুঃসহ গহনে মন্ত্র পড়ে
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।

৩৩
শিকড়, ব্যথিত শিরা, মানুষের অতল উৎসার
এর ওর মুখে এত ভাঙা ছবি সাজিয়ে রেখেছ!
জানো না আমিও ঠিক সেইভাবে চেয়েছি তোমাকে
মাটিতে আঙুল দিয়ে খুঁড়ে ধরে যেভাবে এ বট।

৩৪
এখানেই ছিলে তুমি? এইখানে ছিলে একদিন?
ছুঁয়ে দেখি লাল মাটি, কান পেতে শুনি শালবন
সমস্ত রাত্রির প্রেত সঙ্গে নিয়ে ঘুরি, আর দেখি
তোমার শরীর নেই, তোমার আত্মাও আজ ঢেকে গেছে ঘাসে।

৩৫
আমি কি মৃত্যুর চেয়ে ছোটো হয়ে ছিলাম সেদিন?
আমি কি সৃষ্টির দিকে দুয়ার রাখিনি খুলে কাল?
ছিল না কি শষ্পদল আঙুলে আঙুলে? তবে কেন
হীনতম অপব্যয়ে ফেলে রেখে গেছ এইখানে?

৩৯
পাত্র তো সুন্দর, কিন্তু কানায় কানায় ভরা বিষ
দেখো, অভিভূত হও, ঠোঁটে তুলে নিয়ো না কখনো।
ঝলক লেগেছে চোখে, দুপুরে পারদ, হল্‌কা ওঠে
চেতনা বধির ক'রে ভাসমান তরল আগুন।

৪০
উঁচু হয়ে জেগে আছে নষ্ট প্রতিভার মরা ডাল
আকণ্ঠ কলঙ্কে বুঝি দুঃখ উঠেছিল কত দূর।
আজ নেমে গেছে সব, ছিন্ন শাঁসগুলি মনে রাখো
দুপাশে মহুয়া, কিন্তু মাঝখানে সামাজিক সাঁকো।

৪১
ঝাঁপ দিয়ে উঠে আসে কয়েক রক্তিম বিন্দু জল।
আমার বুকের কাছে, নিশ্চিন্ত শকুন ডানা ঝাড়ে।
সবুজ, সবুজ হয়ে শুয়ে ছিল প্রাকৃত পৃথিবী
ভিতরে ছড়িয়ে আছে খুঁড়ে-নেওয়া হৃৎপিণ্ডগুলি।

৪২
আমার শরীরে কোনো গান নেই। কাঠুরেরা আসে
একে একে কেটে নেয় মরা ডাল গুঁড়ি ও শিকড়
তার পরে ফেলে রাখে মাঠের পশ্চিম পাশে, আর
দূরের লোকেরা এসে ধুলোপায়ে বেচাকেনা করে।

৪৪
দাও ডুবে যেতে দাও ওই পদ্মে, কোরকে, কোমলে
দাও চোখ ধুয়ে দাও ভেরের আভায়, জন্মভোর
শিরায় শিরায় বাঁধো, পাপড়িগুলি ঢেকে বলে যাও
ফিরে যাওয়া যাওয়া নয়, সেই আরো কাছাকাছি আসা।

৪৬
কথা ব'লে বুঝি ভুল, লিখে বুঝি, হাত রেখে বুঝি
এ রকম নয় ঠিক, এ তো আমি চাইনি বোঝাতে।
কাগজের মুখ নিয়ে সভাশেষে ফিরে গেলে লোকে
মনে হয় ডেকে বলি : এইবার ঠিক হবে, এসো।

৫০
নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতে
ঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহরে উজানে
তারই কাছে এসে ওই পাঁজরে পালক রেখেছিলে
তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে।

৫১
কেন কষ্ট পাও? কেন ওই হাতে হাত ছুঁতে চাও?
জলের লহরী যেন ভাস্কর্য ধরেছে বুকে এসে।
পুরোনো অভ্যাসবশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নষ্ট মাথা
চন্দন পায়ের তলে, চোখের পাতায় তুলসী পাতা।

৫২

আজও কেন নিয়ে এলে ভ্রষ্ট এই অন্ধ মৃত্যুজপ
দুরূহ যুবারা যাকে ভালোবেসে প্রসিদ্ধ করেছে!
ধমনী শিথিল জলে ভরে দেয় ঘূর্ণমান তারা
হাজার স্লিপিং পিল মাথার ভিতরে আত্মহারা।

৫৫

প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় যেন
কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল?
থেমে-থাকা বৃষ্টিবিন্দু হাড় থেকে টলে পড়ে ঘাসে
ভেজা বিকেলের পাশে ডানা মুড়ে বসে আছে আলো।

৫৮

কিছু-না-পারার এই ক্লীব খোলসের বন্দী ভ্রূণ
গোপন রাত্রির স্তূপে পড়ে আছে পরিত্যাগে রাগে
হাওয়ায় জাগানো মুখে অবিরাম জ্বলে থাকে ক্ষার
সহজ হয়নি তার যে-কোনো সহজ অধিকার।

৬০

তুমি কি কবিতা পড়ো? তুমি কি আমার কথা বোঝো?
ঘরের ভিতরে তুমি? বাইরে একা বসে আছো রকে?
কঠিন লেগেছে বড়ো? চেয়েছিলে আরো সোজাসুজি?
আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি।

৬১

প্রতি মুহূর্তের ধান আসক্ত মুঠোয় রাখি ধরে
তার পরে যায় যদি অবাধ সন্ন্যাসে ঝরে যায়
এই মাঠে আসে যারা সকলেই বোঝে একদিন
এক মুহূর্তের মুখ আরেক মুহূর্তে সত্য নয়।

৬২

খুব অল্প ভালো লাগে এইসব বহু বিচ্ছুরণ
খান খান হতে থাকা রংকরা সামাজিকতায়।
মাটির ভিতরে শস্য নিভৃত আশ্বাস নিয়ে বাড়ে
বুকে ঈথারের ভারে নিশ্চল হয়েছি একেবারে।

৬৩
মাটি খুব শান্ত, শুধু খনির ভিতরে দাবদাহ
হঠাৎ বিস্ফারে তার ফেটে গেছে পাথরের চাড়।
নিঃসাড় ধুলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর
যে লেখায় জ্বর নেই, লাভা নেই, অভিশাপও নেই।

৬৪
ঘিরে ধরে পাকে পাকে, মুহূর্তে মুহূর্ত ছেড়ে যাই
জলপাতালের চিহ্ন চরের উপরে মুখে ভাসে
তাঁবু হয়ে নেমে আসে সূর্যপ্রতিভার রেখাগুলি
স্তব্ধ প্রসারিত-মূল এ আমার আলস্যপুরাণ।

ত্রিতাল

তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু
শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা ছাড়া
তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু
বুকে কুঠার সইতে পারা ছাড়া
পাতালমুখ হঠাৎ খুলে গেলে
দুধারে হাত ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া
তোমার কোনো ধর্ম নেই, এই
শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়া ছাড়া।

শ্মশান থেকে শ্মশানে দেয় ছুঁড়ে
তোমারই ওই টুকরো-করা-শরীর
দুঃসময়ে তখন তুমি জানো
হল্‌কা নয়, জীবন বোনে জরি।
তোমার কোনো ধর্ম নেই তখন
প্রহরজোড়া ত্রিতাল শুধু গাঁথা—
মদ খেয়ে তো মাতাল হতো সবাই
কবিই শুধু নিজের জোরে মাতাল!

বৈরাগীতলা

সেদিন কোথায় গিয়েছিলাম জানতে চেয়েছিলে
সহজ করে বলেছি বন্ধুকে–
গাঁয়ের নাম উজালডাঙা, সইয়ের নাম জবা
পথ গিয়েছে বৈরাগীদের বুকে।

শরীর থেকে শীতের বাকল শহর গেছে খুলে
মাথার উপর ছড়িয়ে গেছে হাঁস–
ঠিক তখনই সৌরধুলোয় অন্ধ, বলেছিলাম
এই গোধূলি অনন্তসন্ন্যাস!

অম্‌নি সবাই প্রান্তে মিলায়, ঝাপসা রেখে আমায়
সঙ্গিনী যায় বৈরাগীগৌরবে–
দুহাত দিয়েই ধরেছিলাম, রইল না তো তবু
হাতেই কোনো ভুল ছিল কি তবে?

উলটোরথ

ট্রেনের থেকে ঝাঁপ দিয়েছে ধানশিয়রে
গলার কাছে পাথরবাঁধা বস্তামানুষ

মাটির থেকে উঠছিল তার মাতৃভূমি
বুকের নীচে রইল বিঁধে বৃহস্পতি

ইচ্ছে ছিল তমালছোঁয়া দুঃখ ছিল
কিন্তু হঠাৎ টান দিয়েছে উলটোরথে

এসেছিলাম আমরা সবাই এসেছিলাম
বলতে বলতে ঝাঁপ দিল তাই অন্ধকারে

কামরাজোড়া অন্য সবাই চমকে উঠে
অল্প মুখের কৌতূহলে দেখল শুধু

ছন্দ আছে আসা-যাওয়ার ছন্দ আছে
আর তা ছাড়া ধ্বংস তো নয় বরং এ যে

সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে
দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়

উলটোরথের ভিখিরি দেশ খুঁজে বেড়ায়
গলায় পাথর বুকের নীচে বৃহস্পতি।

অন্ধ

ছোবল নিয়ে সে ঢুকেছে গহনে গহনে
সব সবুজকে করে দিয়ে যাবে শাদা
তুমি তার দিকে তাকিয়ে দেখোনি কখনো
হাত-পা আমার লতায় রেখেছ বেঁধে
মহাদেশ জুড়ে ঈথারে প্রতিধ্বনিত
পাথরে পাথরে শব্দের মাথাখোঁড়া

মনে হয় যেন ধ্বসে পড়ে যাবে সবই আজ
পুরোনোই নয়, নতুন সম্ভাবনাও
সকলেরই বুকে জাগা প্রকাণ্ড আমিতে
ভিতরে ভিতরে ঘন হয়ে আছে হাওয়া
ফিরে চলে যাওয়া ধমনীতে কেউ ডাকেনি
পাথরে পাথরে শব্দের মাথাখোঁড়া

খঙ্গো খঙ্গো খুবলে নিয়েছে অস্ত্র
হৃৎপিণ্ডে সে ঢালে মাদকের থুৎকার
চোখের উপরে লক্ষ লক্ষ শলাকা
উলটিয়ে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে শূন্যে

কাড়ানাকাড়ায় বাজিয়ে তুলেছে মজ্জা
পাথরে পাথরে শব্দের মাথাখোঁড়া

ছোবল নিয়ে সে ঢুকেছে গহনে গহনে
অন্ধকে ছুঁয়ে বসে আছে অন্ধরা।

ভয়

সি আই টি রোডের বাঁকে পাথরকুচির উপর
হাত ছড়িয়ে দিয়ে
ঘুমিয়ে আছে আমার মেয়ে
বুকের কাছে এনামেলের বাটি।

আজ সারাদিন ধরে বৃষ্টি ঝরেছে ওর ভিক্ষের উপর
তাই বুঝতে পারিনি
কোন্‌টা ছিল জল আর কোন্‌টা-বা কান্না।
সেদিন যখন হারিয়ে গিয়েছিল কানাগলির ঘূর্ণায়
কেঁদে উঠেছিল
অনাথ মেয়েরা যেমন করে কাঁদে।

বলেছিলাম, ভয় কী
আমি তো ছিলাম তোর পিছনে।

কিন্তু আমারও ভয় হয় যখন ও ঘুমিয়ে পড়ে
আর ওর ঠোঁটের কোণের মেঘ ভেঙে
গড়িয়ে আসে একটুকরো আলো।

জ্যাম

ভালুকের পেটে ভালুকের থাবা।
স্থির হয়ে আছে কালের অসীম।
ঝুলে পড়ে আছে জিরাফের গলা
ঝাঁপ দিয়ে ওঠে জেব্রা ক্রসিং।

ঝটপট ক'রে ক'হাজার হাঁস
ছিঁড়ে নিতে চায় এ ওর পালক–
বাতুল দুপুরে ডুগডুগি নিয়ে
গান গেয়ে যায় ভিখারি বালক।

মাঝে মাঝে শুধু খসে পড়ে মাথা
কিছু-বা পুরোনো কিছু-বা তরুণ।
হাঁক দিয়ে বলে কনডাকটর :
পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন।

শ্লোক

সেই মেয়েটি আমাকে বলেছিল :
সঙ্গে এসো, বেরিয়ে এসো, পথে।
আমার পায়ে ছিল দ্বিধার টান
মুহূর্তে সে বুঝেছে অপমান
জেনেছে এই অধীর সংকটে
পাবে না কারো সহায় একতিলও–
সেই মেয়েটি অশথমূলে বটে
বিদায় নিয়ে গাইতে গেল গান।

আমি কেবল দেখেছি চোখ চেয়ে
হারিয়ে গেল স্বপ্নে দিশাহারা
শ্রাবণময় আকাশভাঙা চোখ।

বিপ্লবে সে দীর্ঘজীবী হোক
এই ধ্বনিতে জাগিয়েছিল যারা
তাদেরও দিকে তাকায়নি সে মেয়ে
গ্লানির ভারে অবশ ক'রে পাড়া
মিলিয়ে গেল দুটি পায়ের শ্লোক।

দশক

কথা বলছিল শাদা তিন বুড়ি
সাবেককালের প্রথায় :
সবদিক এত চুপচাপ কেন?
সেই ছেলেগুলি কোথায়?

মরা হয়ে আসে বিকেলের আলো
শহিদবেদির ঋণ—
নিচু নিশ্বাসে ভালোয় ভালোয়
গেল আরো এক দিন।

বেদি আর বুড়ি, মাঝখানে কিছু
হাড় হয়ে আছে ঘাস—
একা পেলে তারা পায়ে বিঁধে বলে :
কিছু কি শুনতে পাস?

মুণ্ডমালায় ওই হেঁটে যায়
দশ বছরের দেনা।
বুড়ি শুধু ডাকে : ও বাপু ছেলেরা
কেউ কিছু বলবে না?

পিকনিক

মনে পড়ে আমাদের ডায়মন্ডহারবারে পিকনিক।

বৃষ্টিভরা মেঘগুলি জমে ছিল নদীর ওপারে
এপারে গম্ভীর ছিল বসতির মধ্যে ভাঙা চার্চ
মাঝখানে ভাসমান নৌকো নিয়ে মগ্ন ছিল জাল।

মনে পড়ে সকলের ব্যস্ত যৌবনের তাপ থেকে
অগোচরে ঘুরে যাওয়া পাতাময় শীতল ভিতরে
যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সনাতন ক্রস, কন্‌ফেশন।

কিন্তু কোন্ কন্‌ফেশন? ভয় হয়। চলো ফিরে যাই।
ওইপার থেকে মেঘ এপারে আসেনি এতদিনে?
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে নেওয়া হয়ে গেছে শেষ।

আমাকে নেয়নি কেউ, আমাদের, তাই সারি সারি
বসেছি মেঘের দল, কিন্তু কোনো বৃষ্টি নেই বুকে
অবাধ ভাতের স্বাদে ফিরে আসে সাবেক আহ্লাদ।

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, বৃষ্টি নয় ঠিক
ভুক্তাবশেষের দিকে লুব্ধ কাক, ইতর শিশুরা,
ঢেউ লেগে নৌকোগুলি চলে যায় নদীর ওধারে।

তারপরে উঠে আসি, শরীরে সজল প্রবণতা।
শোনা যায় আমাদের ডায়মন্ডহারবারে পিকনিকে
ফিরে আসবার পথে কারা যেন পাথর ছুঁড়েছে।

পাথর ছুঁড়েছে? কিন্তু কনফেশন? চলো ফিরে যাই।

ভাষা

নিচু হয়ে বসে আছি পথের কিনারে, হাতে বাটি
যাওয়া-আসা করে লোক, স্রোত আছে, মনোবল নেই।

সূর্যরেখা ভরে দেয় প্রহরে প্রহরে, যেন জল
এ ছাড়া সম্বল নেই, হাওয়া শুধু মুছে নেয় চোখ।

এ হাওয়া তোমারও চোখে তার চোখে এর তার চোখে
কেন তবে আমাদের আরো কিছু জানাশোনা নেই?

ধুলো মাখি বুকে, কিন্তু তবু চোখে জল নেই কেন?
কেন মনোবল নেই? কেন এ ধাতব শব্দে আলো

হাতুড়ি নাচায় শূন্যে? আমি শুধু নিচু ও নিথর
মাথায় আঘাত চেয়ে এতদূর প্রতীক্ষায় কেন?

যাওয়া আসা করে চোখ, চোখের পাথরে ঘূর্ণি, স্রোত
বুঝি না ওদের নাম, করুণা বা ক্রোধের প্রভেদ

এমনকী ছুঁই না ওই নিম বা শিরীষও, ভয় হয়
ভয় হয় যদি ওরা কথা বলে ইংরেজি ভাষায়!

আত্মঘাত

এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ?
এ কোন্ জগৎ আজ গড়ে দিতে চাও চারদিকে?
এ তো আমাদের কোনো যোগ্য ভূমি নয়, এর গায়ে
সোনার ঝলক দেখে আমাদের চোখ যাবে পুড়ে।
বুঝি না কখনো ঠিক এরা কোন্ নিজের ভাষায়
কথা কয়, গান গায়, কী ভাষায় হেসে উঠে এরা

পিষে ধরে আমাদের গ্রামীণ নিশ্বাস, সজলতা,
কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হলো পাপ।
আমার ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে। গ্রামের অশথ
মনে পড়ে। তাকে আর এনো না কখনো এইখানে।
এইখানে এলে তার হৃদয় পাণ্ডুর হয়ে যাবে
এইখানে এলে তার বিশ্বাস বধির হয়ে যাবে
বুকের ভিতরে শুধু ক্ষত দেব রাত্রির খোয়াই।
আমার পৃথিবী নয় এইসব ছাতিম শিরীষ
সব ফেলে যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি, শুধু জেনো
আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে, তাই হব
পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী।

দাবি

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে মনে রেখো পিছনে কী ছিল।
দায়িত্ব সুন্দর, প্রতিমুহূর্ত বাড়িয়ে দেয় হাত
সম্পর্কে আনন্দে দূর্বাজলে।
হয়তো সে নিজেই দেয় না, নিজে তুলে নিতে হয় তাকে
আধেক গড়নে কোনো অভিমানী প্রতিমাবলয়।
অবসাদে ভরে আসে চোখ?
হোক, তবু তুমি তো সমস্তখানি নও
ততটা নিজস্ব পাবে যতখানি ছেড়ে দিতে পারো।
কেউ এসে বসেছিল, কেউ উঠে চলে গেল, কেউ কথা বলেনি কখনো
মন তার চিহ্ন রাখে সবই।
কুঠুরিতে কুঠুরিতে আর্ত স্বরে ভয় পেয়ে উঠে যায় কবুতরদল
গলায় শিকলচিহ্ন লাল হয়ে জ্বলে থাকে দুরূহ রশ্মির চাপা টানে
মন তার চিহ্ন রেখে দেয়।
তবু তুমি ভুলে যেতে পারো না কখনো এরই দায়ে
জীবন তোমার কাছে দাবি করেছিল যেন প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি কবি।

ভাস্কর

সেই ব্রাহ্মমুহূর্তের পিঙ্গল প্রবাহ থেকে জাল ফেলে তুলেছিল আলো
গঙ্গার যুবক সঙ্গীদল
ভাস্করের হাতেগড়া আদম শরীর, বুকে দাহ।
আমরা ছিলাম বিস্ফারিত
এলেমেলো ডাঙার নৌকোয় বসে পূর্বপাথরের দিকে চেয়ে।
আমাদের কপালের যেন ঠিক মাঝখানে সেই মুহূর্তের কোনো গম্ভীর আঙুল
স্পর্শ রেখে চলে গেল। আর, সেই থেকে
সেই থেকে আমাদের শরীরের আবরণ হয়ে আছে আলো
আমরা সহজে যাই ভস্মাধার থেকে ভস্মাধারে
এত যে নিশান ওড়ে, সব নিশানের কেন্দ্রে আমাদেরই রক্তচাপ দেখি
অগণ্য থাবার লাফ আমাদের কাছে এসে ভেঙে যায় বুদবুদের জলে
বটের মজ্জার থেকে তুলে আনি আমাদের প্রাত্যহিক চোখের যমুনা—
আমাদের হেরে যাওয়া সাজে?
ওই হাত নিয়ে তুমি কোথায় পালাবে ভাবো যে-হাতে সূর্যের রেখা আছে?

শিলালিপি

রঙে ভেসে যায় চোখ ঝলকে ঝলকে তবু অন্তরাত্মা দেখে অন্ধকার
শব্দের প্লাবনে ডুবে জলজ ভুবনডাঙা নিঃশব্দ বধির হয়ে আছে
তীরের ফলকগুলি খুলে নেওয়া হয়ে গেছে বহু ক্ষত সাড় নেই শুধু
ধূমল পূজার গন্ধ এক বুকে টেনে নেয় মণ্ডপের পাশে ছোটো মঠ
বালির খরতা নিয়ে জিবে এসে লেগে থাকে প্রতিবিন্দু আনন্দের জল
ভাস্কর্যে ধরেছি গতিমালা
ধ্বংসের কিনারা গাঁথা জীবন পাথর হলো তার সামনে ফুল নিয়ে দাঁড়া।

অগস্ত্যযাত্রা

বিন্ধ্য বলেন, 'অগস্ত্য
বড্ড আমায় ভোগাস তো
আর কতদিন রাখব নত এ-মস্তক!'

অগস্ত্য কন, 'বিন্ধ্য রে
আটকে আছি ভিন দোরে
কিন্তু তোকেই ভাবছি এত দিন ধরে।

আর কটা দিন থাক্ না ভাই
আগে তো মৌচাক নাবাই
তারপরে মান ফিরিয়ে দেব সমস্ত।'

তাই শুনে আজ বিন্ধ্যরাজ
লাস্যে হলেন দিলদরাজ
গুগলি-শামুক দেখলে ভাবেন নমস্য।

সকলের গান

কামাখ্যা তার শিখর থেকে
ব্রহ্মপুত্র দেখায়
তিরিশ বছর থমকে আছে
বশিষ্ঠ-আশ্রমে
নবগ্রহের নীলসবুজে
ঝাঁপিয়ে ওঠে পা–
কিন্তু আমি আমিই কি না
আজ সে হিসেব হবে।
লাঞ্ছনাতে বয়স মাপে
শাদা খড়ির দাগ
সমস্ত গা-য় উলকি দিয়ে

হলকা তোলে শিখার–
সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন
শুনতে পেলাম সুর
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গলায়
ভূপেন হাজারিকার।

আবার সাড়া লাগল চোখের
জলের উপত্যকায়
অন্ধ হয়ে যাবার আগে
হাত বাড়াতে চাই।
কে যেন গান গেয়েছিলেন
গঙ্গা আমার মা
কী দিয়ে তাল দেবে দু-হাত
মশাল না কি ছাই।
টুকরো করে দেব আবার
একান্ন তার ভাগ
উড়িয়ে দেব গাঙ্গেয় দিন
অখণ্ড নিশ্বাসের–
সেই মুহূর্তে আবার যেন
শুনতে পেলাম সুর
ভূপেন হাজারিকার গলায়
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের।

আমাদের শেষ কথাগুলি

আমাদের শেষ কথাগুলি গড়িয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে
আমাদের শেষ কথাগুলি

মৃত মানুষদের চোখে ভরে গেছে অর্ধেক আকাশ
আমাদের শব্দের ওপারে

তালসারির ভিতর থেকে উঠে আসছে আজ রাত্রিবেলা
নাম-না-জানা যুবকদের হৃৎপিণ্ড

তাদের রক্তের জন্য পথে পথে কলসি পাতা আছে
আমরা সসম্মানে তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাই

আর আমাদের কথাগুলি গোল আর ঝকঝকে হয়ে
গড়িয়ে যায় গতদিনের দিকে।

যদি

যদি আমি দেশ হয়ে শুয়ে থাকি আর এই বুকের উপরে যদি চলে যায়
হাজার হাজার পা-র চলাচল

রক্তের ভিতরে শুধু বয়ে যায় জলস্রোত প্রতিটি রোমাঞ্চে যদি
ধান জেগে ওঠে

কান পেতে শুনি যদি মাঠ থেকে ফিরবার অবিরাম জয়ধ্বনি
চন্দনার গান

প্রতিটি মুখের থেকে যদি সব বিচ্ছেদের হেমন্তহলুদ পাতা
ঝরে যায়

হাত পেতে বলে যদি, এসো ওই আল ধরে
চলে যাই সেচনের দেশে

যদি মাটি ফুলে ওঠে আর সব খরা ভেঙে
ছুটে আসে বিদ্যুতের টান–

হতে পারে, সব হতে পারে যদি এই মহামৃত্তিকায় আমার মুখের দিকে
ঝুঁকে থাকো আকাশের মতো।

চড়ুইটি কীভাবে মরেছিল

১
ওরা চলে যাবার পর মনে হলো ঘরই আমার আকাশ
গান গাইলাম স্বাধীন

উড়াল দিলাম পুবপশ্চিম নীচের থেকে ওপরে আর
দেয়াল থেকে দেয়াল

জানলাদরজা ঠুকরে দিলাম কাঠঠোকরার আদর দিয়ে
লুকোনো-সব খড়কুটোতে ছড়িয়ে দিলাম ঘর

সবই আমার সবই আমার এই খুশিতে ফুলে উঠল
বুকের কাছে মখমলের শাদা

ডানায় ডানায় ঢেউ তুললাম গলায় গলায় ঢেউ তুললাম
বিস্তারে বিস্তারে

ওরা চলে যাবার পর মনে হলো ঘরই আমার আকাশ
গান গাইলাম অনেক।

২
প্রহর? কত প্রহর হলো? এখনও কি দিন হয়নি?
আলোর পথ কোথায়?

টেবিল থেকে চেয়ারে আর চেয়ার থেকে গ্রিলের ওপর
স্বাধীনতার শেষ?

আকাশ থেকে ছিঁড়ে আমায় ঘরের মধ্যে আকাশ দিয়ে
কোথায় গেছে ওরা?

গলার কাছে শুকনো লাগে, বুকের কাছে শূন্য লাগে, ভুল করে কি একটা দানাও
রেখে যায়নি ফেলে?

টেবিল থেকে চেয়ার আর চেয়ার থেকে গ্রিলের ওপর
কত প্রহর আর?

মুক্তি তো নয় এরা আমায় জাঁকজমকে ঘের দিয়েছে
উড়াল দাও উড়াল দাও পাখা!

৩
কিন্তু কোথায় উড়াল দেবে? পুবপশ্চিম ওপরনীচে
শাদা কেবল শাদা কেবল শাদা

একটা কোনো বিন্দু নেই যে বাতাস নেব ডানায় ভরে
অবশ হয়ে এল আমার গান

এ ঘের আমায় খুলতে হবে ভেবে এবার ছুটতে থাকি
অসম্ভবের কোণগুলিতে ঝুঁকে

বুকের কাছে আস্তে আস্তে জমতে থাকে শাদা পাথর
ডানাও ছোট্ট পাটাতনের মতো

পুবপশ্চিম ওপরনীচে দেয়ালকাঠে ঠুকতে ঠুকতে
ফুরিয়ে আসে নিশ্বাসের রেখা

কাঠের একটা পুতুল হয়ে উলটে গেলাম সদরকোণে
দরজা খুলে দেখুক ওদের ঠান্ডা মাথার খুন!

কোবালম বীচ

বয়স তিরিশ। কিন্তু সেটা খুব বড়ো কথা নয়
কিছু বেশি কিছু কম অনেকেই এ-রকম করে
দেশে বা বিদেশে এই দুশো বছরের ইতিহাসে
অনেকেই এ-রকম শূন্য থেকে শূন্যে মিশে যায়
ভাঙা ডানা পড়ে থাকে রাজপথে, গুহামুখে, চরে।

এইখানে বাঁক নিয়ে বাঁয়ে উঠে গেছে বড়ো টিলা
ডাইনে আরবজল স্থির হয়ে আছে একেবারে
নারকেলপাতার থেকে কিছুদূরে ভেসে আছে চাঁদ
আমাদের চোখে আছে লঘু পালকের ছায়া, আর
মুখে জাল, শুনি সব অপঘাত উত্তরেদক্ষিণে।
সেই এক, একই কথা, লবণে ভরেছে ফুসফুস
সেই যবনিকা তুলে আরো আরো আরো যবনিকা
খুলে দেখা বীজ যার কোথাও কিছুরই মানে নেই–
অনেকেই এ-রকম শূন্য থেকে শূন্যে মিশে গেছে।

বেশ কিছুদিন হলো দেশবিদেশের মেলা শেষ
ঘরের চৌকাঠে ফিরে আপাতত নেই লোনা হাওয়া–
আয়নায় দাঁড়িয়ে তবু এখনও হঠাৎ তাকে দেখি
বন্ধুর গল্পের শেষে যেন তার আত্মা তুলে নিয়ে
না তাকিয়ে নিচু স্বরে বালির উপরে হাত রেখে
কর্ণাটকি যে-ছেলেটি বলেছিল কোবালম বীচে
'কিছু একটা করতে চাই, মরব না এভাবে বসে থেকে!'

হেতালের লাঠি

হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।
কিন্তু বড়ো ঘুম, এক কালঘুম মায়াঘুম কেন
কেবলই জড়ায় চোখ, অবসাদে ভরে দেয় শিরা
সমস্ত চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে
ঢিল হয়ে আসে মুঠি, খসে আসে হেতালের লাঠি।

তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর ক'রে
নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে

আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।
আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।

মন্ত্রীমশাই

মন্ত্রীমশাই আসবেন আজ বিকেলবেলায়। সকাল থেকে
অনেকরকম বাদ্যিবাদন, পুলিশবাহার। আমরাও সব যে-যার মতো জাপটে আছি
ঘরখোয়ানো পথের কোনা।
মন্ত্রীমশাই আসবেন আজ, তখন তাঁকে
একটি কথা বলব আমি।
বলব যে এই যুক্তিটা খুব বুঝতে পারি
সবাইকে পথ দেবার জন্য কয়েকজনকে সরতে হবে।
তেমন-তেমন সময় এলে হয়তো আমায় মারতে হবে
বুঝতে পারি।
এ-যুক্তিতেই ভিটেমাটির উর্ণা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম
অনেক আগের রাতদুপুরে ঘোরের মতো
কণ্ঠাবধি আড়িয়ালের ঝাপটলাগা থামিয়েছিলাম
কম্বুরেখায় অন্ধরেখায় মানিয়েছিলাম
ছাড়তে হবে
সবার জন্য কয়েকজনকে ছাড়তে হবে।
কিন্তু সবাই বলল সেদিন, হা কাপুরুষ হদ্দ কাঙাল
চোরের মতো ছাড়লি নিজের জন্মভূমি।
জন্মভূমি? কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল।
দিন কেটেছে চোরের মতো দিনভিখারির ঘোরের মতো
পথবিপথে, জন্মভূমির পায়ের কাছে ভোরের মতো
জাগতে গিয়ে স্পষ্ট হলো
সবার পথে সবার সঙ্গে চলার পথে

আমরা শুধু উপলবাধা।
আমরা বাধা? জীবন জুড়ে এই করেছি?
দেশটাকে যে নষ্ট করে দিলাম ভেবে কষ্ট হলো।
এখান থেকে ওখানে যাই এ-কোণ থেকে ওই কোনাতে
একটা শুধু পুরোনো জল জমতে থাকে
চোখের পাশে
আড়িয়ালের কিনার ঘেঁষে, কিন্তু তবু বুঝতে পারি
সবার জন্য এই আমাদের কয়েকজনকে সরতে হবে।
একটা কেবল মুশকিল যে মন্ত্রীমশাই
ওদের মতো সবার মতো এই ভুবনের বিকেলবেলায়
জন্মভূমির পায়ের কাছে সন্ধ্যা নেমে আসার মতো
মাঝেমধ্যে আমারও খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে—

তার কী করা?

লজ্জা

বাবুদের লজ্জা হলো
আমি যে কুড়িয়ে খাব
সেটা ঠিক সইল না আর
আজ তাই ধর্মাবতার
আমি এই জেলহাজতে
দেখে নিই শাঠ্যে শঠে।

বাবুদের কাচের ঘরে
কত-না সাহেবসুবো
আসে, আর দেশবিদেশে
উড়ে যায় পাখির মতো—
সেখানে মাছির ডানায়
বাবুদের লজ্জা করে।

আমি তা বুঝেও এমন
বেহায়া শরমখাকী
খুঁটে খাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়।
খেতে তো হবেই বাবা
না খেয়ে মরব না কি!

বেঁধেছ বেশ করেছ
কী এমন মস্ত ক্ষতি!
গারদে বয়েস গেল
তা ছাড়া গতরখানাও
বাবুদের কব্জা হলো–
হলো তো বেশ, তাতে কি
বাবুদের লজ্জা হলো?

দেশ আমাদের আজও কোনো

জঙ্গলের মাঝখানে কাটা হাত আর্তনাদ করে
গারো পাহাড়ের পায়ে কাটা হাত আর্তনাদ করে
সিন্ধুর স্রোতের দিকে কাটা হাত আর্তনাদ করে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
সমুদ্রে গিয়েছ তার ঢেউয়ের মাথার থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
আলের ভিতর থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
চূড়া বা গম্বুজ থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
তোমার চোখের সামনে লাফ দিয়ে আর্তনাদ করে
সমবেত স্বর থেকে সব ধ্বনি মেলানো অকূলে
কণ্ঠহীন সমবেত স্বর
ধড় খুঁজে আর্তনাদ করে
হৃৎপিণ্ড চায় তারা শূন্যের ভিতরে থাবা দিয়ে
ধ্বংসপ্রতিভার নাচে আঙুলের কাছে এসে আঙুলেরা আর্তনাদ করে
জলের ভিতরে কিংবা হিমবাহ চূড়ার উপরে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর

অর্থহীন শব্দগুলি আর্তনাদ করে আর তুমি তাই স্তব্ধ হয়ে শোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনও।

আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

বৈশম্পায়ন বললেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের ছত্রিশ বছর কেটে গেলে বৃষ্ণিবংশে ঘোরতর দুর্নীতি দেখা দিল। সেই দুর্নীতিপ্রভাবে যাদবেরা একদিন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করলেন। মৌষলপর্ব, মহাভারত।

আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

সময় ছিল হলুদজল, গন্ধ বুনো বল্লীদের
আবহমান মাটির
সাগরপার আর পাহাড়তলির ছড়ানো এই মিলনকোণ
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব।

কালপুরুষ ঘুরে বেড়ায় গোপন পায়ে ঘরে ঘরে
উপড়ে নেয় মগজ
ইঁদুর ঘোরে উল্কা খসে পলক ফেলতে কবন্ধ
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

সবাই সবার পাশ দিয়ে যাই কেউ কাউকে দেখতে পাই না
পাখির ঝাঁকও ডাইনে বেঁকে ওড়ে
বৃষ্টি নেই, সূর্য চাঁদ ধূসর লাল শামলা রং
বৃত্ত করে ঘোরায় নিজের পাশে

গরুই আজ গাধার মা, হাতির বাচ্চা খচ্চরের
বেজির পেটে ইঁদুর
সারস ডাকে পেঁচার মতো, ছাগলদের শেয়ালডাক
ঘরের বুকে রক্তপায়ে পাণ্ডুরং কপোত

ডালপালার কোটর ভেঙে একে একে বেরিয়ে আসে
সাত্যকি আর কৃতবর্মার দল
পায়ের ক্ষুরে জয়ধ্বনি আঙুলচুড়োয় জয়ধ্বনি
আমাদের এই তীর্থে ঘোর উৎসব

হঠাৎ সবাই তাকিয়ে দেখি নিজের নিজের হাতের দিকে
সবুজ ঘাস? ভল্ল? না কি মুষল?
লাফ দিয়েছে হরিণ, তার চমক সোনায় ঝলসে ওঠে
শেষ বিকেলের বোঝাপড়ার দিকে

আমরা যাদব আমরা বৃষ্ণি আমরা অন্ধক
ঘোর তীর্থে আজ আমাদের খেলা
হৃদয়ভানে এগোই আর কণ্ঠনালী আঁকড়ে ধরি
সূর্য যখন গড়ায় জলের নীচে

সবাই সবার চোখে ঘাতক, দেখি লুব্ধ লালা
নিজের নিজের সত্য বানাই নিজে
পাতা ঝরছে মাথার ওপর শিশিরজলে পাপ ধোয় না
চারদিকে ঢেউ, ফসফরাসের আলো

যাদব, আমরা বৃষ্ণি কিংবা অন্ধক
সাত্যকি বা কৃতবর্মার দল
মদ আমাদের আত্মঘাতের ভবিতব্য, বারণ ছিল
এ উৎসবে সবাই আজ মাতাল

জয়ধ্বনি তোলে নিশান আমার নিশান তোমার নিশান
ভল্ল? না কি মুষল? না কি ঘাস?
আমাদের এই পায়ের নীচে ভিন্ন সব জলস্রোত
তাপ্তী আর কৃষ্ণা আর গঙ্গা

এই সে লোক প্রাণ নিয়েছে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার
খড়ের চালে হঠাৎ লাগায় ফুলকি
ইমানহীন ক্লীব আর সুড়ঙ্গময় গুপ্তঘাতী
এই সে লোক ওই সে লোক এই সে

মনে কি নেই ঘুমের মধ্যে কিশোরদের হত্যা
বিস্ফোরণ, হাত-পা বাঁধা চুরমার
সবুজ ঘাস হলুদ ঘাস তীক্ষ্ণ ঘাস শরবনের
এবার সব ফিরিয়ে দেবার সময়

পুবের থেকে পশ্চিমে চাই, ভাঙছে অলীক উলটো খাঁচা
আমাদের এই তীর্থে এমন উৎসব
ত্রয়োদশীয় অমাবস্যা, চোখের মধ্যে বেঁধে বর্শা
লাফিয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ডের আগুন

ছিটকে আসে হরিণ, তার মুক্তি নেই উদ্‌গতির
শরীর থেকে ছিঁড়ছে সব সুঘ্রাণ
কৃতবর্মার মাথায় ওই খড়্গ তোলে সাত্যকি
যাদব নেই, বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক

আমরা আর যাদব নই, অন্ধক বা ভোজ
শৈনেয় বা বৃষ্ণি আমরা আজ
যাজকদের আগুনে আজ লাল নীল সবুজ শিখা
খুঁজে বেড়ায় ঝলসে নেবার হরিণ

সত্যকে আজ ঘুরিয়ে নিলেই এক লহমায় মিথ্যে, আর
মিথ্যেকেই বানিয়ে নিই সত্য
পাতায় পাতায় খুঁজে বেড়াই কে আমাদের শত্রু, যেন
কারোই কোনো বন্ধু নেই কোথাও

আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব
আত্মঘাতের শবের ওপর উঠে আসছে লবণজল
সাগরজলে ভাসে আমার বংশ

চোখের সামনে সাত্যকি আর প্রদ্যুম্নের বিনাশ
মনে পড়ে গান্ধারীশাপ শাম্বরঙ্গ ছল
অমোঘ নিয়ম ফলতে থাকে, ধুইয়ে দেয় অতীতভার
আমরা এগোই জলস্রোতও এগোয়

এই আমাদের শবের ওপর মিলছে এসে জলস্রোত
তাপ্তী আর শতদ্রু বা গঙ্গার
পুবপশ্চিম ভাঙতে ভাঙতে ছুটে যাচ্ছে হস্তিনাপুর
আমরা এগোই জলস্রোতও এগোয়

যেদিকে চাই প্লাবনজল, ঘোড়াও যেন মাছের মতো
রথগুলি-বা ভেলা
পথ আবর্ত, ঘরগুলি হ্রদ, শেওলা যত রত্নরাশি
যেদিকে চাই যেদিকে চাই সাঁতরে যায় কুমির

ডুবুক সব শস্ত্র রথ, ধুয়ে ফেলুক সাগরজল
আমাদের এই প্রভাস যাক থেমে
ছুটছে কোন অভিষেকের অঘোর জল অতল জল
সবল জল হস্তিনাপুর মুখে

হরিণ তার রক্তরেখা মিলিয়ে দেয় শতদ্রুতে
ব্রহ্মপুত্রে ছড়িয়ে রাখে অজিন
মুখোশ ঝোলে মধ্যদেশে শিঙের বাহার জ্যোৎস্নাময়ী
গন্ধ কেবল উড়ছে দেশজোড়া

আমাদের এই তীর্থে আজ ভেঙে পড়ার উৎসব
তাকিয়ে আছে হাজার মাঠ গহ্বর
বিনাশ তার আনন্দের উৎসারের প্রতীক্ষায়
ঝলসে ওঠে আকাশমুখী চিমনি

আমাদের এই তীর্থজল মাঠ খামার গহ্বরের
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব
ধ্বংস আর বিশ্বাসের, বিনষ্টি আর সৃষ্টিমুখ
আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব

আমাদের এই তীর্থে ঘোর উৎসব
আমাদের এই তীর্থে শেষ উৎসব

১৯৮৩

ভিখিরির আবার পছন্দ

থাক সে পুরোনো কাসুন্দি
যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক
যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে
ভাঙবার শুধু সময় চাই

ভাঙবার শুধু সময় চাই
এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়
হব কদিনের বাসিন্দা
কে না জানে সব অনিত্য।

কে না জানে সব অনিত্য
নিয়ে যাই তাই খড়কুটো
বেঁচে যে রয়েছি এই-না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ।

ভিখিরির আবার পছন্দ
ঠিকই পেয়ে যাব যে-কোনো ঠাঁই
আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায়
কেটে যাবে দিন আনন্দে।

কেটে যাবে দিন আনন্দে
ভাসমান সব বাসিন্দার।
জীবন তো একই কাসুন্দি
ভিখিরির আবার পছন্দ!

কাব্যতত্ত্ব

কাল ও-কথা বলেছিলাম না কি?
হতেও পারে, আজ সেটা মানছি না।

কাল যে-আমি ছিলাম, প্রমাণ করো
আজও আমি সেই আমিটাই কি না।

মানুষ তো আর শালগ্রাম নয় ঠিক
একইরকম থাকবে সারাজীবন।
মাঝে মাঝে পাশ ফিরতেও হবে
মাঝেমাঝেই উড়াল দেবে মন।

কাল বলেছি পাহাড়চূড়াই ভালো
আজ হয়তো সমুদ্রটাই চাই।
দুয়ের মধ্যে বিরোধ তো নেই কিছু
মুঠোয় ভরি গোটা ভুবনটাই।

আজ কালকে যোগ দিয়ে কী হবে?
সেটা না হয় ভাবব অনেক পরে।
আপাতত এই কথাটা ভাবি–
ফূর্তি কেন এত বিষম জ্বরে?

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
  তোমার জন্য গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

একটা দুটো সহজ কথা
  বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।

কে কাকে ঠিক কেমন দেখে
  বুঝতে পারা শক্ত খুবই
হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হা রে আমার জন্মভূমি!

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
  তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা-কিছু আজ ব্যক্তিগত।

মুখের কথা একলা হয়ে
  রইল পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।

জন্মদিন

তোমার জন্মদিনে কী আর দেব শুধু এই কথাটুকু ছাড়া
আবার আমাদের দেখা হবে কখনো

দেখা হবে তুলসীতলায় দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়
দেখা হবে সুপুরিবনের কিনারে

আমরা ঘুরে বেড়াব শহরের ভাঙা অ্যাসফল্টে অ্যাসফল্টে
গনগনে দুপুরে কিংবা অবিশ্বাসের রাতে

কিন্তু আমাদের ঘিরে থাকবে অদৃশ্য কত সুতনুকা হাওয়া
ওই তুলসী কিংবা সাঁকোর কিংবা সুপুরির

হাত তুলে নিয়ে বলব, এই তো, এইরকমই, শুধু
দু-একটা ব্যথা বাকি রয়ে গেল আজও

যাবার সময় হলে চোখের চাওয়ায় ভিজিয়ে নেব চোখ
বুকের ওপর ছুঁয়ে যাব আঙুলের একটি পালক

যেন আমাদের সামনে কোথাও কোনো অপঘাত নেই আর
মৃত্যু নেই দিগন্ত অবধি

তোমার জন্মদিনে কী আর দেব শুধু এই কথাটুকু ছাড়া যে
কাল থেকে রোজই আমার জন্মদিন।

মেঘের মতো মানুষ

আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ওই এক মেঘের মতো মানুষ
ওর গায়ে টোকা দিলে জল ঝরে পড়বে বলে মনে হয়

আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ওই এক মেঘের মতো মানুষ
ওর কাছে গিয়ে বসলে ছায়া নেমে আসবে মনে হয়

ও দেবে, না নেবে? ও কি আশ্রয়, না কি আশ্রয় চায়?
আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ওই এক মেঘের মতো মানুষ

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমিও হয়তো কোনোদিন
হতে পারি মেঘ!

বোধ

যে লেখে সে কিছুই বোঝে না
যে বোঝে সে কিছুই লেখে না
দু-জনের দেখা হয় মাঝে মাঝে ছাদের কিনারে
ঝাঁপ দেবে কি না ভাবে অর্থহীনতার পরপারে!

পদ্মসম্ভব

পাহাড়ের এই শেষ চূড়া
এইখানে এসে তুমি দাঁড়িয়েছ আজ ভোরবেলা
তোমার পায়ের নীচে পদ্মসম্ভবের মূর্তি, গুম্ফার উপরে আছো তুমি
বর্ণচক্র ঘোরে চার পাশে
ঘৃতপ্রদীপের থেকে তিব্বতি মন্ত্রের ধ্বনি মেঘের মতন উঠে আসে
ধ্বনির ভিতরে তুমি অবলীন মেঘ হয়ে আছো
যতদূর দেখা যায় সমস্ত বলয় জুড়ে পাষাণের পাপড়ি মেলে দেওয়া
দিগন্তে দিগন্তে ওই কুয়াশামথিত শিখরেরা
পরিধি আকুল করে আছে
তার কেন্দ্রে জেগে আছো তুমি
আর এই শিলামুখে বহুজনমুখরতা থেকে
আবেগের উপত্যকা থেকে
মুহূর্তের ঘূর্ণি থেকে চোখ তুলে মনে হয় তুমিই-বা পদ্মসম্ভব
তোমার নিরাশা নেই তোমার বিরাগ নেই তোমার শূন্যতা শুধু আছে।

ক্যান্সার হাসপাতাল

রোজ আসতে আসতে সবারই সঙ্গে জানাশোনা হয়ে যায় একদিন
সবারই দিকে তাকিয়ে বলা যায় : এই-যে, কেমন!
গ্রহণের সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় বেশ সহজে।

গ্রহণের সূর্যের দিকে তাকানো যায় সহজে
কোনো অপরাধের কথা কোনো ক্ষতির কথা মনে থাকে না আর
আমারও ইচ্ছে করে এমনসব কথা বলি যার কোনো মানে নেই

আমারও ইচ্ছে করে এমনসব বলি যার কোনো মানে নেই
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা একটাই মাত্র স্তূপের মতন ঊর্ধ্বতায়
মুহূর্তের বল্মীকে ভরে থাকে যার অগোচর ধ্যান

মুহূর্তের বল্মীকে ভরে থাকে যার ধ্যান
তার ভিতর থেকে তাকিয়ে দেখা যায় জায়মান অশথের পাতাগুলি, শুধু
আমাদের মাঝখানে জেগে থাকে পুরোনো এক হালকা পর্দা

আমাদের মাঝখানে একটাই সেই পর্দা এখনও স্থির
সীমান্তের কাছে থেকে জলতরঙ্গের শব্দ শুনে শুনে
চৌকাঠ পেরিয়ে গহ্বরের দিকে পা বাড়াই, ফিরে আসি

চৌকাঠ পেরিয়ে গহ্বরের দিকে ফিরে আসি, আর
পথচলতি চিৎকারের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে মনে পড়ে
দেখে এসেছি ক্যান্সার হাসপাতালে সকলেই আজ বেশ হাসিখুশি।

স্বপ্ন

আ, পৃথিবী। এখনও আমার ঘুম ভাঙেনি।

স্বপ্নের মধ্যে তুমুল পাহাড়
পরতে পরতে তার পাপড়ি খুলে দিচ্ছে

খুলে দিচ্ছে সবুজ পাপড়ি, ভিতরের থেকে ভিতরে,
খুলছে, খুলে দিচ্ছে, আর তার মাঝখান থেকে জেগে উঠছে ধানজমি

যখন লক্ষ্মী আসবে
লক্ষ্মী যখন আসবে

তখন কৃপাণ আর পাইপগান হাতে খানায়খন্দে ওরা কারা– আ, পৃথিবী
এখনও আমার ঘুম ভাঙেনি।

পোশাক

অনেকদিন হলো
পরব না পরব না করেও পোশাক পরা হলো অনেকরকম।

ছেড়ে ফেলতে কোনো কষ্ট নেই তো?
তাহলেই হলো।

নাচগান চলছেই চারপাশে
মাঝে মাঝে হিজড়েরাও কোমর বাঁকিয়ে চলে যায়—

কতরকম কাঁকড়াবিছে, তোরণ,
আর অন্ধিসন্ধি

কথা হলো, তুমি ঠিক কেমনভাবে
তোমার মতো হবে।

হৃৎকমল

চিতা যখন জ্বলছে
তোমরা চাও আমি তখন আলোর কথা বলি
বলব আলোর কথা।

বলব যে, ভাই, আরো কিছুক্ষণ
এ ওর মুখের উল্‌কি দেখে
কাটিয়ে দেব সময়। বলব আলোর কথা।

চণ্ডালকেই মুক্তি ভেবে খুঁচিয়ে দেব আগুন
ফুলকি দেখে দেখে বলব আলোর কথা
ভাবব ওই তো জয়ধ্বজা, শ্মশান, বড়ো ধূম লেগেছে হৃৎকমলে

চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে
ধুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে
এই তো আমার

এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা।

শেকল বাঁধার গান

ছিটকিনি খুলে অক্ষরগুলি বেরিয়ে পড়েছে পথে আজ সারারাত বেলেল্লা নাচ হবে
কানায় কানায় উপচে পড়ছে আপ্লুত আহ্লাদ
জানলা দিয়ে দেখি
শেকল গড়িয়ে আসছে পায়ে পায়ে বেঁধে নিচ্ছে তালবেতাল টান
শপাং শব্দে ঢেউ উঠছে ঢেউ উঠছে ছত্রিশ ব্যঞ্জনে
অঙ্কশায়ী স্বরধ্বনিগুলি
বলছে এ কী মুক্তি এ কী স্বাধীন সংগৎ এ কী সুখ তন্দ্রাহারা
জানলা দিয়ে দেখি কে নাচায় কে নাচে কার ঝনৎকার নাচে

শপাং শব্দে ঢেউ উঠছে খোলা পথে দিগ্‌বিদিকে উছলে উঠছে গা
এ কী মুক্তি এ কী সুখ
কার হাতে চাবুক সেটা দেখা যায় না শুধু
নরম চামড়ার শব্দ চামড়ায় চামড়ায় শব্দ শীৎকারে আতুর
ছত্রিশ ব্যঞ্জন আর অঙ্কশায়ী স্বরধ্বনিগুলি
পায়ের শেকলে আনছে ঝনৎকার স্বাধীন থৈ থৈ তা তা থৈ
চারদিকে সোর ওঠে আরে ভাই কেয়াবাৎ কামাল কর দিয়া
ছিটকিনিও নেচে ওঠে উড়ে যায় খিল আর সারারাত জানলা দিয়ে দেখি

কার হাতে চাবুক সেটা দেখা যায় না শোনা যায় কেয়াবাৎ শুধু
তারাগুলি মুদ্রা হয়ে ঝরে পড়বে বলে যেন লেগে থাকে আকাশের গায়ে
কানায় কানায় উপচে পড়া
শেকলের ঝনৎকার খোলা পথে বেজে ওঠে পায়ে পায়ে থৈ তা তা থৈ
সবুজ কপিশ লালে স্বরে ও ব্যঞ্জনে
নিজেরই আহ্লাদ ভেবে নেচে ওঠে ছিটকিনি বা খিল

কার হাতে চাবুক সেটা দেখা যায় না শোনা যায় জানলা দিয়ে দেখি
শপাং শব্দে ঢেউ উঠছে স্বাধীন সংগৎ এ কী মুক্তি এ কী সুখ তন্দ্রাহারা

ছিটকিনি খুলে অক্ষরগুলি বেরিয়ে পড়েছে পথে আজ সারারাত বেলেল্লা নাচ হবে

মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়

'তারপর আট মাসের মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিয়ে যুবতী বধূটিও...'

মনে হয় অনেকদিনই
সে কিছু বলছিল না
ভেবেছে অভাব তো নেই
দড়িরও না কলসিরও না!
যদি জল সামনে থাকে
অতলে বাঁধবে তাকে
সাত না– হাজার পাকে
জলে কি মন ছিল না?
ভেবে সে অনেকদিনই
কিছু আর বলছিল না।

'আমি কি মানুষ নিয়ে
কেবলই পুতুল খেলি?'
বলে সে 'আয়রে পুতুল
জলে আজ তোকেই ফেলি!
আহা রে নতুন চোখে
একদিন কোন্ আলো-কে
দেখে তুই কিসের ঝোঁকে
জড়াবি বিয়ের চেলি
তার চেয়ে আয় মামণি
আগে আজ তোকেই ফেলি!'

তারপর বিসর্জনের
জোড়া ঢাক পাড়ায় পাড়ায়
এ-রকম ঘটেই থাকে
ভেবে লোক কষ্ট তাড়ায়
কিছুদিন স্থির থাকে জল
ছবিও দেয় অবিকল–
কবে ফের মত্ত মাদল
সে-জলের গ্রাসকে নাড়ায়
ভেবে সব খুঁজছে পুতুল
মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়!

খবর সাতাশে জুলাই

পরিচারিকার নিগ্রহ– ও. সি.-র স্ত্রী ধৃত
মালদহে দুটি খুন
গর্বাচভকে রেগন দিলেন চিঠি
পারমাণবিক সাহায্য নিয়ে ফ্রান্স-পাক কথা হবে
আফ্রিকাজোড়া বিভীষিকাময় খরাকবলিত শিশুদের
মুখ ভেবে আজ ইনডোরস্টেডিয়ামে
সুপারস্টার
স্টার
সুপারস্টার
ধুম তাতা তাতা থৈ
কিশোরীর নাকি হাতটান ছিল হাতটান
গায়ে তাই ঢেলে দিয়েছে গরম জল
অবশ্য তাকে দেখতেও যায় দুবেলা হাসপাতালে
ধুম তাতা তাতা থৈ তাতা তাতা থৈ
৬৬০ জন গেরিলা শান্তিশিবিরে
দেখামাত্রই গুলি কারফিউ পশ্চিম দিল্লিতে
ভারত হারাল দক্ষিণ কোরিয়াকে
ফিগার কীভাবে রেখেছেন তার রহস্য বলা হবে এ-কাগজে
আরো বলা হবে মিলনের রূপরেখা

জেলাকংগ্রেসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে
বোন তারা দুটি বোন তারা শুধু খেতে চায় রুটি চায়
এমন তো কিছু মারাও হয়নি ফোস্কা পড়েছে গায়ে
পুড়ে গেছে শুধু কোমরের নীচ থেকে
ও. সি.-র মা ও স্ত্রী
আপাতত আছে জামিনে, তাছাড়া
আড়াইশো গ্রাম হেরোইন হাতে ধরা পড়ে শুধু একজন, আর
খরাকবলিত রহস্য নিয়ে নাচ হবে আজ ধুম তাতা তাতা ইনডোরস্টেডিয়ামে।

অন্ধবিলাপ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন :

ধর্মক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে সমবেত লোকজনেরা
সবাই মিলে কী করল তা বলো আমায় হে সঞ্জয়

অন্ধ আমি দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
কাজেই কোথায় কী ঘটছে তা সবই আমায় জানতে হবে

সবই আমায় বুঝতে হবে কার হাতে কোন্ অস্ত্র মজুত
কিংবা কে কোন্ লড়াইধাঁচে আড়াল থেকে ঘাপটি মারে

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
এবং লোকে বলে এদেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে

কারা এসব রটিয়ে বেড়ায় বলো আমায় হে সঞ্জয়
অন্ধ আমি, কিন্তু তবু এসব আমায় জানতে হবে

তেমন তেমন তম্বি করলে বাঁচবে না একজনার পিঠও
জানিয়ে দিয়ো খুবই শক্ত বন্ধাতে এই রাষ্ট্র ধৃত

অসম্ভবের কুলায় আমার পালক দিয়ে বুলিয়ে যাবে
সেই আশাতে ঘর বাঁধিনি, দুর্যোধনরা তৈরি আছে

এবং যত বৈরী আছে তাদের মগজ চিবিয়ে খাবে
খাচ্ছে কি না সেই কথাটা জানাও আমায় হে সঞ্জয়

সামান্য এক ছটাক জমি ছাড়বে কেন আমার ছেলে
আমার সঙ্গে ভূমিসেনা আমার সঙ্গে ভূস্বামীরা

আমার সঙ্গে দ্রোণ বা কৃপ আমার সঙ্গে ভীষ্মবিদুর
সেদিক থেকে দেখতে গেলে ধর্মরাজ্য এমন কী দূর

দুষ্টে বলে, মনে মনে তারা আমার কেউ না কি নয়
সেটাও যদি সত্যি হয় তো একাই একশো আমার ছেলে

তারাই জানে শমনদমন, ধ্বংস দিনে ধ্বংস রাতে
ছড়িয়ে যাবে ঘটল যা সব আরওয়ালে কানসারাতে

যে যা করে তাকে তো তার নিশ্চিত ফল ভুগতে হবে
কোথায় যাবে পালিয়ে, দেখো সামনে আমার সৈন্যব্যূহ

তিনদিকে তিন দেয়াল ঘেরা সাতান্ন রাউন্ড গান্ধীমাঠে
ভিজল মাটি ভিজল মাটি ভিজুক মাটি রক্তপাতে।

অধর্ম? কে ধর্ম মানে? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি?

মারব না কি নির্ভূমিকে? নিরন্নকে? নিরস্ত্রকে?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে!

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
সৈন্যে শস্ত্র ছুঁড়ছে তা নয়– কোষ থেকে তা আপনি ছোটে

মাঝেমাঝেই ছুটবে এমন– ব্যাস তো জানেন আমার দশা
এই যে আমার একশো ছেলে– কেউ বশে নয় এরা আমার

এইরকমই অন্ধ আমি, আমিই তবু রাজ্যশিরে
–কিন্তু কারা শপথ নিল নিজেরই হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে?

ধানজমিতে খাসজমিতে সমবেত লোকজনেরা
ধেয়ে আসছে সামন্তদের– কেন এ দুঃস্বপ্ন দেখি?

পুব থেকে পশ্চিমের থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কে
অক্ষৌহিণী ঘিরবে বলে ফন্দি করে আসছে ঝেঁপে?

লোহার বর্মে সাজিয়ে রাখি কেউ যেন না জাপটে ধরে
স্বপ্নে তবু এগিয়ে আসে নারাচ ভল্ল খড়্গ তোমর–

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
নিদেনকালে সমস্তদিক নাশকচিহ্নে ছড়িয়ে যাবে

সন্ধ্যাকাশে দুই পাশে দুই শাদালালের প্রান্ত নিয়ে
কৃষ্ণগ্রীব মেঘ ঘুরবে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত

বাজশকুনে হাড়গিলেতে ভরবে উঁচু গাছের চুড়ো
তাকিয়ে থাকবে লোহার ঠোঁটে খুবলে খাবে মাংস কখন

মেঘ ঝরাবে ধুলো, মেঘেই মাংসকণা ছড়িয়ে যাবে
হাতির পিঠে লাফিয়ে যাবে বেলেহাঁস আর হাজার ফড়িং

কাজেই বলো, হে সঞ্জয়, কোন্ দিকে কার পাল্লা ভারী?
জিতব? না কি নিদেনকালের জাঁতায় পিষে মরব এবার?

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধেক কি ছাড়তে হবে?
টুকরো টুকরো করব কি দেশ পিছিয়ে গিয়ে সগৌরবে?

যে যাই বলুক এটাই ধ্রুব– আমার দিকেই ভিড়ছে যুব
তবুও শুধু ব্যাস যা বলেন সেটাই কি সব ফলবে তবে?

ফলুক, তবু শেষ দেখে যাই, ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়
ইঙ্গিতে-বা বলছে লোকে আমার না কি মরণদশা

বাজশকুনে হাড়গিলেতে তাকিয়ে আছে লোহার ঠোঁটে–
ধানজমিতে খাসজমিতে জমছে লোকে কোন্ শপথে

কিসের ধ্বনি জাগায় দূরে দিকে এবং দিগন্তরে
দেবদত্ত পাঞ্চজন্য মণিপুষ্পক পৌণ্ড্র সুঘোষ

শেষের সে-রোষ ভয়ংকরী সেই কথাটা বুঝতে পারি
কিন্তু তবু অন্ধ আমি, ব্যাসকে তো তা বলেইছিলাম

বলেছিলাম এটাই গতি, ভবিতব্য এটাই আমার
আমার পাপেই উশকে উঠবে হয়তো-বা সব খেত বা খামার

আমার পাপেই উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক

কোন্ খেতে বা কোন্ খামারে সমবেত লোকজনেরা
জমছে এসে শস্ত্রপাণি বলো আমায় হে সঞ্জয়

সমবেত লোকজনেরা কোথায় কখন কী করছে তা
শোনাও আমায়, অন্ধ আমি, শোনাও আমায় হে সঞ্জয়

শোনাও আমায় শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সঞ্জয়!

শিশুরাও জেনে গেছে

কী হতভাগ্য সেই দিন যখন শিশুরাও জেনে গেছে গাছ কখনো কথা বলতে পারে
না আর সাতভাই চম্পাকে ডাকতেও পারে না কোনো পারুলবোনের
রূপকথা

কী হতভাগ্য সেই দিন যখন বুকের ভিতর দিকে ছুটে যায় বাঁধভাঙা জল কিন্তু
চোখ তাকে ফিরেও ডাকে না শুধু অযুত আতশবাজি শোভা হতে হতে
শূন্যের গহ্বরে ভেঙে অন্ধ হয়ে দেখে

পাথরের মুখচ্ছবি নেই কিন্তু মুখের পাথরছবি আছে

কী হতভাগ্য সেই দিন যখন গর্জনতেল ভুলে শুকনো দাঁড়িয়ে থাকে নিঃস্বপ্ন
প্রতিমা কোনো গাছ আর একটাও কথা বলতে পারে না এই হিমানীর
ঘরে

কী হতভাগ্য সেই দিন যখন চম্পাকে বুক ভরে ডাকতেও পারে কোনো পারুল
আর শিশুরাও জেনে গেছে সেইসব কথা।

যন্ত্রের এপার থেকে

যন্ত্রের এপার থেকে কথা বলতে বলতে শব্দগুলি জলস্তম্ভ তোমাকে তারা ছুঁতে
পারে না আর তুমিও দেখতে পাও না মুখচ্ছবি কোথায় কীভাবে ভাঙে
কেননা কেবলই স্তম্ভ, জল নেই স্নানজল নেই
অথবা বালির ঝড় উলটোমুখে ছুটে যাওয়া পথে পথে পেতে রাখা জালগুলি কিছু
ওড়ে কিছুবা জড়িয়ে যায় পায়ের ভিতরে তার অন্ধকারে মজ্জার ভিতরে
আমি বলি এই শব্দ ছিল শুধু নৌকো হয়ে তোমাকে সে তুলে আনবে আমার ঘুমের
কাছে বিশ্ববিকাশের কাছে যে-কোনো ঘুমের মধ্যে নতুন জন্মের ভ্রূণ আছে
ভেবে ডাক দিই শোনো
যন্ত্রের এপার থেকে সেইসব শব্দ আজ ঘূর্ণ্যমান সুদর্শনে ছিঁড়ে দেয় অর্থদল নতুন
জন্মের কথা গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে এধারে ওধারে আর তোমাকে ছোঁয়
না তারা, তাই

প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে অবিচুয়ারির স্তূপ গেঁথে
যন্ত্রের এপারে আমি বসে থাকি বসে থেকে ভাবি যদি একদিন কোনো এক
রাত্রিবেলা অতর্কিত অন্ধকারে তোমার বুকের সব রুদ্ধ পাপড়ি খুলে
খুলে শহর সমুদ্রে নামে

শহর সমুদ্রে নামে স্নান নিতে, ঘুমের ভিতরে।

ভালোবাসা অর্ধেক স্থপতি

যখন এক জীবনের কাজের আমূল ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ভাবি এইবার
তাহলে কোন্‌দিকে যাব
যখন এক পা থেকে আরেক পায়ের দূরত্ব মনে হয় অলীক যোজন ছায়ায় ঝাপসা
হয়ে-থাকা স্থিরতা
যখন মূর্তির কোনো-এক নিরর্থ খণ্ড হাতে তুলে নিয়ে মনে পড়ে কোন্ মূর্খের স্বর্গে
ছিল আমার বসবাস
কেননা ভেবেছিলাম আমিই তো জাগিয়ে তুলতে পারি তোমার হৃৎপিণ্ড, তোমার
সত্তা

যখন সেই স্তূপের ভিতর থেকে কেঁপে ওঠে শুধু হাজার হাজার নিষ্প্রাণ আঙুলের
উৎক্ষেপ
যখন তার অনুচ্চার অভিযোগ গড়িয়ে পড়তে থাকে আমার সমস্ত ব্যর্থতার গায়ের
ওপর আগুনের ঝর্না
যখন কোষগুলির মধ্যে চিৎকার শোনা যায় বলো তাহলে বলো এইবার কোন্ পথ
আর বাকি রইল অবাধ আস্তরণের সামনে
ঠিক তখনই স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যে এই ভ্রষ্ট সচলতার দিকে তাকিয়ে আজ খুঁজে
বেড়াই অন্য আরো অর্ধেক, কেননা

ভালোবাসা অর্ধেক স্থপতি!

তাই এত শুকনো হয়ে আছো

অনেকদিন মেঘের সঙ্গে কথা বলোনি তাই এত শুকনো হয়ে আছো এসো তোমার
মুখ মুছিয়ে দিই
সকলেই শিল্প খোঁজে রূপ খোঁজে আমাদের শিল্পরূপে কাজ নেই আমরা এখানে
বসে দু-একটি মুহূর্তের শস্যফলনের কথা বলি
এখন কেমন আছো বহুদিন ছুঁয়ে তো দেখিনি শুধু জেনে গেছি ফাটলে ফাটলে
নীল ভগ্নাবশেষ জমে আছে
দেখো এই বীজগুলি ভিখারির অধম ভিখারি তারা জল চায় বৃষ্টি চায় ওতপ্রোত
অন্ধকারও চায়

তুমিও চেয়েছ ট্রামে ফিরে আসবার আগে এবার তাহলে কোনো দীর্ঘতম শেষকথা হোক
অবশ্য, কাকেই-বা বলে শেষ কথা। শুধু
দৃষ্টি পেলে সমস্ত শরীর গলে ঝরে যায় মাটির উপরে, আর ভিখারিরও কাতরতা ফেটে যায় শস্যের দানায় এসো মেঘ ছুঁয়ে বসি আজ বহুদিন পর এই হলুদডোবানো সন্ধ্যাবেলা।

টল্‌মল্‌ পাহাড়

তোমার মৃত চোখের পাতা ভেঙে উঠে আসছে বাষ্পগহ্বর আর তাকে ঢেকে দিতে চাইছে কোনো অদৃশ্য হাত যখন চারপাশে ফাটলে ফাটলে ভরে গিয়েছে টল্‌মল্‌ পাহাড়
দৃষ্টিহারা কোটরের প্রগাঢ় কোলে ঝর্ঝর গড়িয়ে নামছে অবিরাম কত নুড়িপাথর আর আমরা হলুদ হতে থাকা শ্বেতকরোটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি স্থির–
যেন কুয়াশার ভিতর থেকে উঠে আসছে চাঁদ
অথচ শনাক্ত করা যায় না আজও এত অভিসম্পাতের ভিতরে ভিতরে বিষাক্ত লতাবীজের ঘন পরম্পরা কে তোমার মুখে তুলে দিয়েছিল সেদিন, ঝিমধরা শীতরাত্রির অবসরে।

আমি জীবনেরই কথা বলি যখন এই নীল অধোনীল নিশ্বাসের প্রতিচ্ছায়ায় ছড়িয়ে থাকা পাতাগুলি কেঁপে উঠতে থাকে বাসুকীর শিরে আর মর্মের মর্মরে হা হা করে ওঠে তরাইয়ের জঙ্গল
আমি জীবনেরই কথা বলি যখন জান্তব পদচ্ছাপ দেখতে দেখতে ঢুকে যাই দিগম্বর অন্ধকারের ভিতরে ভিতরে কোনো আরক্তিম আত্মঘাতের ঝুঁকেথাকা কিনারায়
আমি জীবনেরই কথা বলি যখন তোমার মৃত চোখের পাতার ওপর থেকে অদৃশ্য হাত সরিয়ে নিয়ে কোটরে কোটরে রেখে যাই আমার অধিকারহীন আপ্লুত চুম্বন–

তোমার মৃত চোখের পাতা ভেঙে উঠে আসছে·বাষ্পগহ্বর আর তাকে ঢেকে দিতে চাইছে কোনো অদৃশ্য অশ্রুত হাত এই টল্‌মল্‌ পাহাড়।

সৈকত

আজ আর কোনো সময় নেই এই সমস্ত কথাই লিখে রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই
যে নিঃশব্দ সৈকতে রাত তিনটের বালির ঝড় চাঁদের দিকে উড়তে উড়তে
হাহাকারের রুপোলি পরতে পরতে খুলে যেতে দেয় সব অবৈধতা আর
সব হাড়পাঁজরের শাদাধুলো অবাধে ঘুরতে থাকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে শুধু একবার
একবারই ছুঁতে চায় ব'লে।

আর নীচে দুইপাশে কেয়াগাছ রেখে ভিতরের সরু পথ যেমন গিয়েছে চলে অজানা
অটুট কোনো মসৃণ গ্রামের মুখে এখনও যে তা ঠিক তেমনই অক্ষত আছে
সেকথা বলাও শক্ত তবু এই সজল গহ্বর এই সর্বস্ব মাতন নিয়ে এ রাতের
সমুদ্রবিস্তার তার স্তনন শোনায় যতদূর,

সে-পর্যন্ত জেগো না ঘুমন্ত জন ঘুমাও ঘুমাও ওই গ্রামের উপরে উড়ে পড়ুক
নিঃশব্দ সব বালি আর তোমাকেও অতর্কিতে তুলে নিক নিঃসময় কোলে
নিক অন্ধকারে কিংবা আলো-আঁধারের জলসীমানায় নিক পদ্মের কোমল-
ভেদে মৃত্যু এসে দাঁড়াক জন্মের ঠোঁট ছুঁয়ে

আজ আর সময় নেই সমস্ত কথাই আজ লিখে রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই
এই সমস্ত কথাই

স্তব

তুমিই আবর্ত, তুমি পিণ্ড, তুমি লূতাতন্তুজাল
নিশ্বাসপরিধি, তুমি মজ্জাভুক বোধেন্দুবিনাশ

তুমিই নৈবেদ্য, তুমি ফুলজল, বিগ্রহও তুমি
তোমারই বিশাল শবে আমাদের জন্মনীল ভূমি

•

তুমি যা রচনা করো তা-ই একমাত্র সত্য জানি
তাছাড়া, অন্ধের কাছে কীবা রাত্রি কীবা দিন, তাই

তোমার ধ্বনির ঝড়ে ভুলে যাই নিজেদের নাম
বানানো কাঠের হাত সবধারে অগাধ অটুট

তোমার ইশারামাত্র সুতোটানা সালাম সালাম
তোমার ইশারামাত্রে দশচক্রে ভগবান ভূত

তুমিই আবর্ত, তুমি পিণ্ড, তুমি চমৎকার চিতা!

মত

এতদিন কী শিখেছি একে একে বলি, শুনে নাও।
মত কাকে বলে, শোনো। মত তা-ই যা আমার মত।
সেও যদি সায় দেয় সেই মতে তবে সে মহৎ,
জ্ঞানীও সে, এমনকী আপনলোক, প্রিয়। তার চাই
দু-পাঁচটি পালকলাগানো টুপি, ছড়ি, কেননা সে
আমার কাছেই থাকে আমার মতের পাশে পাশে।
না-ই যদি থাকে তত? যদি তার ভিন্ন কোনো মতি
জেগে ওঠে মাঝে মাঝে অন্য কোনো দুষ্টু হাওয়া লেগে?
তবে সেই মতিচ্ছন্ন তোমার শরীর ঘেঁষে যাতে
না আসে তা দেখতে হবে। জানবে-বা কীভাবে তাকে লোকে?
সব পথ বন্ধ করে রেখে দেব– হাঙ্গামায় নয়–
চৌষট্টি কলায়। আমি কত কলা শিখেছি তা জানো?

চরিত্র

কিছুটা গুলিয়ে গেছে। ঘোড়ার সামনেই গাড়ি জোতা।
অবশ্য নতুনও নয়, এ-রকমই সনাতন প্রথা–
বুঝতে একটু দেরি হয়, কোন্‌টা পথ, কোথায় বা যাব
আসলে যাওয়াই কথা, হোক্‌-না সে যাওয়া জাহান্নামে।

ধরো কেউ নিজে থেকে দিতে চায় সব, তা বলে কি
বসে থাকা সাজে? তার টুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে এসো কাছে।
আমাকেই বলতে পারো ঈশ্বরের প্রথম শরিক
করতে পারি সব যদি সঙ্গে থাকে সপ্রেম বুলেট।
ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার মোহনা– যা বলো–
সে কেবল ক্ষমতাকে দাপিয়ে বেড়ানো ক্ষমতায়।
এত ছোটোখাটো কাণ্ডে কেঁদেকেটে মাথা হবে হেঁট?
চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ কোথায়?

লাইন

লাইনেই ছিলাম বাবা, লহমার জন্য ছিটকে গিয়ে
খুঁজেই পাই না আর নিজেকে– কী মুশকিলে পড়েছি!
এটা তো আমারই টিন? আমার না? এটাই আপনার?
সবই দেখি একাকার। আমি তবে কোথায় রয়েছি!
এ কী হচ্ছে? সরে যান-না! আরে আরে– আমরা কি আলাদা?
দেখছেন তো সবকটা এই একসঙ্গে জাপ্‌টানো দড়ি বাঁধা।
থামুন না! তুমি কে হে? আমি? হেই। হোই হেই হাট।
প্রতিবাদ? না না বাপু– কিছুই করছি না প্রতিবাদ।
কোনোমতে ফিরে যাব ফাঁকা টিন বাজিয়ে সহজে–
আগুনই কোথাও নেই– কী হবে-বা জ্বালানির খোঁজে।

বোঝা

হঠাৎ কখনো যদি বোকা হয়ে যায় কেউ, সে তো নিজে আর
বুঝতেও পারে না সেটা। যদি বুঝতই তাহলে তো বুঝদারই
বলা যেত তাকে। তাই যদি, তবে
তুমিও যে বোকা নও কীভাবে তা বুঝলে বলো তো?

বেলেঘাটার গলি

যা দেখি সব চমকপ্রদ, মুন্ডু আছে মাথায়
চৌরাস্তায় চিৎ হয়েছি ছেঁড়া জরির কাঁথায়

চক্ষুও নেই কর্ণও নেই হাত নেই নেই পা-ও
একটাদুটো পয়সা পেলে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাও

পিঠের নীচে ইটের খোঁচা বুকের উপর ফলা
আকাশ তবু পালিশ তবু নদী রজস্বলা

হুকুম দিলে খুলতে পারি বুকের কটা পাঁজর
বলতে পারি, বাজো বাঁশি, আপন মনে বাজো–

আর তাছাড়া সবটা কথা কেমন করে বলি
বাইরে লেনিন ভিতরে শিব বেলেঘাটার গলি!

ন্যায়-অন্যায় জানিনে

তিন রাউন্ড গুলি খেলে তেইশজন মরে যায় লোকে এত বজ্জাত হয়েছে!
স্কুলের যে ছেলেগুলি চৌকাঠেই ধ্বসে গেল অবশ্যই তারা ছিল সমাজবিরোধী।

ওদিকে তাকিয়ে দেখো ধোয়া তুলসীপাতা
উলটেও পারে না খেতে ভাজা মাছটি আহা অসহায়
আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই জানে না বুলেটেরা
দার্শনিক চোখ শুধু আকাশের তারা বটে দেখে মাঝে মাঝে।

পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।

তুমি কোন্ দলে

বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছুঁতে এলে আগে তাকে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দলে
ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দলে
পুলিশের গুলিতে যে পাথরে লুটোয় তাকে টেনে তুলবার আগে জেনে নাও দল
তোমার দুহাতে মাখা রক্ত কিন্তু বলো এর কোন্ হাতে রং আছে কোন্ হাতে নেই
টানেলে মশালহাতে একে ওকে তাকে দেখো কার মুখে উলকি আছে কার মুখে নেই
কী কাজ কী কথা সেটা তত বড়ো কথা নয় আগে বলো তুমি কোন্ দল
কে মরেছে ভিলাইতে ছত্তিশগড়ের গাঁয়ে কে ছুটেছে কার মাথা নয় তত দামি
ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্ নাচ হবে কোন্ পথে কোন্ পথ হতে পারে আরো লঘুগামী
বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল
আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে কানে কানে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দল
রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে প্রশ্ন করো কোন্ দল তুমি কোন্ দল

গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ

১

গন্ধর্ব, উন্মাদ, তুমি অর্থহীন হাতে উঠে এসে
জলমণ্ডলের ছায়া মাখিয়ে গিয়েছ এই মুখে
তবু আজও বৃষ্টিহারা হয়ে আছে সমস্ত প্রবেশ
আমারও পায়ের কাছে চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে।
আমি সর্বনাশ দিয়ে সর্বনাশ বাঁচাতে গিয়েছি
হাত ছুঁতে গিয়ে শুধু আগুন ছুঁয়েছি, আর তুমি
শূন্যের ভিতরে ওই বিষণ্ণ প্রতিভাকণা নিয়ে
আমার মুখের দিকে চেয়ে আছো বিষম পাহাড়ে।
গান কেউ অন্ধকারে নিজে নিজে লেখেনি কখনো
আমাদের সকলেরই বুকে মেঘ পাথর ভেঙেছে
সে শুধু তোমার জন্য, গন্ধর্ব, তোমার হাত ছুঁয়ে
এই শিলাগুল্ম চিরজাগরূক বোধ নিয়ে আসে।

২

গন্ধর্ব, যেখানে তুমি দাঁড়িয়েছ তার ঘন নীচে
সবুজ ভাণ্ডের ওই বর্তুল গহ্বর থেকে আজ
মানুষের স্তব ওঠে, হলাহলও ওঠে মাঝে মাঝে।
সে-কুয়াশাজাল থেকে তুমি দেখো কীভাবে সজল
আঙুল পাতার প্রতি বিন্দু বিন্দু মুছে দিয়ে যায়,
সে-পাতা মেয়ের দল কপালে তিলক করে রাখে।
সেদিন বিকেলে তুমি কুড়িয়ে নিয়েছ পাইনফল
চুম্বন করেছ তাকে শঙ্খের ফুৎকারমতো, আর
ধ্বনি তার আলো হয়ে গড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে
গহ্বরও অঞ্জলি তুলে উঠেছে পায়ের খুব কাছে।
কে বলে বিচ্ছেদ তবে? ঘাসের রোমাঞ্চ ধমনীতে—
শূন্য মাটি সপ্ততল একসূত্রে বেঁধেছে এ-বুকে।

৪

যদি বলি হাত ধরো, ভয় পাও। সবারই হাতের
ভিতরে আরেক হাত জেগে ওঠে, আরো আরো হাত
কোন্ হাত কার কেউ জানে না তা আর, পথ চলি
শতভুজ বহুমুণ্ডে, আড়ে আড়ে চেয়ে দেখি, শুনি
যদি কেউ গান গায় চিত্ররথ হংস বিশ্বাবসু
গোমায়ু তুম্বুরু নন্দী যদি গেয়ে ফেরায় আমাকে
আমার নিজের কাছে, আসমুদ্র হিমাচল ছুঁয়ে
যদি তুমি হাত ধরো, একই হাত! কিন্তু দূরে কাছে
তোমার সমস্ত গানে ডানা ভেঙে পড়ে আছে বক
বিতস্তা বা চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী
তার সব স্রোত নিয়ে ধুয়ে দিতে পারেনি সে-লাল—
প্রতি রাত্রে মরি তাই, প্রতি দিনে আমি হন্তারক।

৫

কিংবদন্তি জানে সেই বুড়োটির কথা, যে এখনও
খরায় জড়ানো দিনে মাটির আঘ্রাণ নিতে নিতে
বলে দিতে পারে বুকে কোন্‌খানে জমে আছে জল
সমস্ত গাঁয়ের লোক তার শীর্ণ চোখে চেয়ে থাকে।
সেই বুড়ো মরে গেলে পৃথিবী অনাথ হবে না কি?

আমাদের জন্য আর ভোগবতী জাগাবে না কেউ?
গন্ধর্ব, বিশ্বাস রাখো, আমরাও জেনেছি শরীর
এইখানে শুয়ে আজ মাটির উপরে কান পেতে
কেঁপে ওঠা তার সব দেশজোড়া ধ্বনি ছুঁতে পাব
সমস্ত ফাটল ঠিকই ভরে দেব জাতকের বীজে
কেননা বিনাশ সেও কোষে কোষে উৎস রেখে যায়
আমাদেরও বুকে আজ জমেছে আগুনভরা জল।

৬

এই শব্দকুহকের সামনে আর সময় থাকে না
আগুন জ্বালবারও আগে দিনপল অন্ধ হয়ে যায়
ছুঁয়ে শুধু বুঝে নিই পাথর জলের ফেনা ঘাস
বর্তুলতা কঠোরতা ভরে নিই হাতের মুঠোয়
বুকে এনে বলি তাকে, আমি অন্ধ, তুমি কি বধির?
শুয়ে আছো বসুন্ধরা, সর্বস্ব ছুঁয়েছ তুমি কার?
দৃশ্য নও শ্রুতি নও, স্পর্শ, তুমি শরীরবিহীন
নিশ্বাসে তামসভরা পাহাড় দেখেছ কোনোদিন?
জেনেছ কি বাতুলের অগাধ মূর্ছনা জানু পেতে?
প্রতি রোমকূপে জ্বেলে ধরেছ পাতালগান? শুধু
ইন্দ্রিয়বিহীন হয়ে ঝরে গেছ পাহাড়ের নীচে
সমস্ত বিস্মৃতি তাই রাত্রি দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি।

৯

ধমনীতে ভরে নেয়। বলে, কিছু জানবার নেই।
ফোটাও মুহূর্তবিন্দু, তারপরে ভাসাও আকাশে
সপ্তর্ষিসীমার থেকে চলে যাবে আরো আরো দূরে
বারে বারে ছিঁড়ে যাবে তুমি আর তোমার সময়।
কিন্তু কাকে গান বলো? কাকে বলো সৌদামিনী পাখি?
যখন চিৎকারশব্দে মেঘ ফেটে যায় অন্ধকারে
দেখোনি কী-নামে তার রুপালি রক্তের রেখা জ্বলে?
নিমেষে মুহূর্তগুলি আরো একবার ছুটে এসে
কীভাবে অঞ্জলি ধরে পাহাড়চূড়ার মতো প্রায়
দেখোনি চলার টানে তার সেই স্থাণুতা কখনো?
বৃষ্টিঝড়ে দাঁড়াও সে চূড়ার উপরে আর জানো
সব টান থেকে এই দেশ তাকে খুলে দিয়ে যায়।

১০

গন্ধর্ব, সেদিন খুব মাথা নিচু করে বসেছিলে
ভিখিরির মতো অন্ধ গলিতে রকের পাশে একা।
তোমারও কি স্বর ভাঙা? তবে আর কার কাছে যাব।
তোমার ধৈবতে আজ নিজেকে লাঘব করে নিয়ে
দু-একটি কথা শুধু বলে যাব সোজাসুজি চোখে
ভেবেছি কত-না দিন জপেছি কত-না দিনরাত।
তুমি জানো কে আমাকে আজকের মুহূর্ত পাব বলে
ছল বল মিথ্যে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে মধ্যরাতে
এবং বলেছে– যাও, অধিকার করে নাও ওকে
কোনো লজ্জা লজ্জা নয়, কোনো মিথ্যে মিথ্যে নেই আর।
আর আমি সেই লোভে ঘূর্ণিপাকে মায়াজাল ছুঁড়ে
তুলেছি হাঙর, আর তারই মুখে হেরেছি মাধুরী।
সে-মাধুরী কী দিয়ে যে খুঁড়ে গেছে সব গঞ্জ গাঁও
এ অন্ধগলিতে বসে তুমি কি জানতেও পাও সেটা?

১১

পদ্মপুকুরের নামে মুঠোভরা এক-গর্ত জল
তার মধ্যে ডুব দিয়ে উঠে আসি অবিকল মুখে
অবিকল– কিন্তু তবু আমাকে চেনে না কেউ আর–
এ মোহিনী ডোবা আজ দিয়েছে-বা আরেক জীবন।
কিন্তু কেন চেনে না সে? জন্ম জন্ম বেঁধে রাখা বীজে
আমার সুষুম্না ছেড়ে কোথায় সে পালাবে ভেবেছে?
'দেখোনি কখনো আগে?' আমি ডেকে বলি, সে আমাকে
ভূতগ্রস্ত ভেবে দূরে সরে যায়, আমি ছুটে গিয়ে
জাপটে ধরি, সে আমাকে, তারপর কে-বা আমি, সে কে
কিছু স্পষ্ট নয় আর, ঝলকে ঝলকে থেকে থেকে
উগ্‌রে ওঠা শ্লেষ্মা পাঁক ঘূর্ণি যেন সুধারসধারে
ছড়ায় দিগন্তে দিকে তলে অবতলে ঊর্ধ্বে অধে–
কোথায় দাঁড়াব আর তখন তোমার পাশে ছাড়া।

১২

তবে কি তোমাকে কাল আহত করেছি ভুল করে?
কথা যদি আজ আর কোনো কথা না বলে কখনো

মুখোমুখি কথামালা আমাদের কতদূরে নেবে?
টোকা দিয়ে দেখি তাই কী বলে সে, কিছু কি বলেছে?
বেঁচে আছে? মরে গেছে? বাঁচামরা এক হয়ে আছে?
না কি ও চিতায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাতিল খোলস
অক্ষরের মুখে শুধু বুনে দেওয়া হলকা, নীল নাচ!
একবিন্দু বেঁচে-থাকা চেয়েছিল স্তব্ধ কথাগুলি
চেয়েছিল ধ্বনি তার উনিশশো নব্বই থেকে ঘুরে
দাঁড়াবে তোমার দিকে মুখ তুলে। লোকেরা যে বলে
'আচ্ছা চলি, দেখা হবে'—কোন্‌খানে দেখা হতে পারে?
কোথাও ঠিকানা আছে? কোনো অভিজ্ঞান? কোনো ছুতো?
কীভাবে বলবে তবে উঠে এসো গান গাও বাঁচো
গন্ধর্ব তুমিও যদি মাথা নিচু করে বসে আছো!

১৩
মনে করো সেই রাত, এক সেল থেকে অন্য সেলে
স্ট্রেচারবাহিত চলা উত্তান মুখের ক্ষত নিয়ে
মুহূর্তের ভুলে চোখ মেলতে গিয়ে রক্তের ঝালরে
বন্ধু-আকাশের মুখে দেখা সেই একইমতো তারা!
প্রতিটি ক্ষতের মধ্যে অর্বুদ কালের মাইল মাইল
পথ পড়ে আছে তবু মনে হয় এত কাছাকাছি।
কিন্তু তারও জ্যোতি ছিল, সে ক্ষতের, স্রোতোবেগ ছিল
পাথর-ঘষ্‌টানো মুখে পাথরের ভাস্বরতা ছিল
বাণীর বিবাহ ছিল এক সেল থেকে অন্য সেলে।
আর আজ সুলাবণি ক্ষতহীন মুখের রেখায়
সব ঘাস হয়ে আছে মরা ফড়িঙের ডানা, চোখে
ব্যথা নেই, চমৎকার অসাড় দিনেরা ঘিরে আছে
দিকে দিকে। আমারও যে একদিন ছিল কিছু, তার
একমাত্র চিহ্ন হয়ে পড়ে আছে শহিদ স্ট্রেচার।

১৪
বালির ভিতরে ওরা ঢুকে যায় পলকে পলকে।
মুছে-যাওয়া দাগ নিয়ে কতমতো কথা বলে লোকে
কত জল ভরে রাখে ওইটুকু লাল ডানা, আর
কত স্থির হয়ে থাকে সমস্ত দিনের অস্থিরতা।

কীভাবে ভেবেছ তুমি নিয়ে যাবে পড়ন্ত ছায়ার
গলে-পড়া বিন্দুগুলি– কার সঙ্গে কাকে দেবে জুড়ে?
সব ভুল জড়ো করে জ্বালিয়ে দিয়েছ শুকনো পাতা
সে-দাহনে জেগে ওঠে জ্ঞান, ওঠে, লাফ দিয়ে ওঠে
সোনালি চিতার মতো, আর তার থাবা বুকে নিয়ে
বালির ভিতরে খুব ছোটো ছোটো পায়ে যেতে যেতে
অবশ শরীর ছুঁয়ে উড়ে যায় সমুদ্রের হাওয়া–
জীবনে বয়স নয়, বয়সে জীবন জুড়ে যাওয়া।

১৫

সেদিনও তোমার সঙ্গে দেখা হলো গলির বাঁ-পাশে।
ভালোই তো আছো মনে হলো। চোখের কোণের দাগ
চোখেও পড়েনি। তুমিও কি ক্লান্ত হও? ভাবিনি তা।
তার পরে বহুদিন খুঁজেছি বাজারে পথে ঘাসে
খুঁজেছি যখন ওরা টেনে ছিঁড়ে আমার পালক
কপালে উলকির টানে পাড়ার তাগুবে ছোঁড়ে হোম
আলগা করে নিতে চায় হাত উরু বুক মূর্ধা চোখ
ছড়ানো কবন্ধ থেকে তুবড়ি জ্বলে ওঠে অন্ধ ব্যূহে
তখনও সে-ঘূর্ণি থেকে খুঁজেছি তোমার চলাচল।
আজ সব ছেড়ে এসে দেখি তুমি বাঁকানো খিলানে
কাচে ঢাকা ম্যমি হয়ে শুয়ে আছো ছায়াজাদুঘরে–
এবারের মতো আর ছুঁয়ে দেখা হলো না তোমাকে।

১৮

খোঁড়া পায়ে এতদূর এসেছি কি কিছু না পেয়েই
ফিরে যাব ভেবে? শোনো, তোমার চাতুরী আমি বুঝি।
হাতেরও আঙুল নেই তবুও প্রথম থেকে ফের
বানাব ছবি ও গান, ছড়াব উজাড় কথামালা।
এক পায়ে এক পায়ে শব্দ তুলে খুঁজে নেব ডেরা
আবারও তোমার সঙ্গে দেখা হবে হিম গিরিখাতে।
ব্যভিচারী তুমি, তুমি যেখানেই যাও আমি যাব
আমারই পাঁজর ভেঙে যদি শুধু মশাল জ্বালাও
আমার করোটি নিয়ে ধুনুচি নাচাতে চাও যদি
তবু আমি কোনোদিন ছেড়ে যেতে দেব না তোমাকে।

এক শতাব্দীর পরে আরেক শতাব্দী আরো এক
আমি যদি না-ও থাকি তবুও আমিই পড়ে থাকে।

২৩

শহর শহরতলি রংরহস্যের ঢল মুছে
চলেছি সীমান্তদেশে। ঝল্‌সানো আলোয় খাক হয়ে
শিখেছি কাকে কী বলে। পিঁপড়ের মতন মুখোমুখি
চকিত আদর রেখে চকিতে পিছনে ফেলে যাওয়া
মুহূর্তের স্বাদে গড়া ছোটো ছোটো চিনির বেসাতি—
এসব তো খুব হলো। আজ তার অন্ধিসন্ধি ফেলে
দূরে ছুঁড়ে জয়োচ্ছল শিখা ভাঁড় ঘুঙুর মাদল
কেবলই পায়ের দাগ ছুঁয়ে ছুঁয়ে পল-অনুপল
শস্যশরীরের দিকে যেতে যেতে আলপথ ভেঙে
নিশানা বাড়ানো এই শরীরের শস্য ঝরে যায়।
আবহে ঘুমের চাপ, কালো হয়ে আসে মখমল,
বহুদিন পরে আজ শরীরে শরীর যায় মিশে,
হাজার আলোকবর্ষ নিশ্বাসের মধ্যে শুষে নিয়ে
মাথার উপরে জাগে কন্যারাশি, হাতে গমশিষ।

২৪

যেসব মানুষ নেই যেসব মানুষ মরে গেছে
যেসব মানুষ তবু কথা বলেছিল একদিন
দ্বাদশীর রাতে তারা আমার বাঁকের কাছে এসে
সরাসরি প্রশ্ন করে : বলো কাকে বলে বহমান।
যেসব মানুষ আজও কষ্ট পায়, যেসব মানুষ
শুধু বেঁচে আছে বলে মরে যেতে চায় বারে বারে
তাদের ক্ষতের নীচে আমার চুমুর শব্দ শুনে
কেউ-বা ঘুমিয়ে পড়ে অতর্কিত ডালপালা ফেলে।
কেবল বটের পাতা নিজের ছায়ার থেকে উড়ে
এমন ছলাৎ বুকে ভোররাতে ভেসে যায়, আর
যেসব মানুষ তবু ভুলে থাকে, যেসব মানুষ
ছেঁড়াজবা নিয়ে আজও আসে না এ জলের কিনারে
তাদের সবার শিরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোলা স্রোতে
সকালবেলার বিষ
সকালবেলার বিষ রোজ আমি ছুঁয়ে গেছি ঠোঁটে।

২৫

এই রাত্রি, টোডরমল, ভেসে আছে আতুর আলোয়
আকাশ আভাসমাত্র, স্থল জল বাষ্প হয়ে আছে
শূন্যের পূর্ণতা নিয়ে ভরে আছে ইবাদতখানা–
এই রাত্রে মনে হয় স্বপ্ন দেখলে দোষ নেই কোনো।
একদিন এই দেশে– সুজলা সুফলা এই দেশে
পাথরে পাথর গেঁথে উঁচু করে বানাব মিনার
সেখানে দাঁড়িয়ে যারা ছিন্নভিন্ন পক্ষাঘাত থেকে
চন্দ্রগরিমার দিকে বাড়াবে অশোক হাতগুলি
তারা কেউ এরা নয়– হিন্দুও না, মুসলমানও নয়,
জৈন বৌদ্ধ খ্রিষ্টানও না, জরথুষ্ট্রি নয়, কিন্তু সবই
একাকার কোনো দীন ইলাহির গোলাপবাগানে
উৎসের আতর ছুঁয়ে প্রাচী-র প্রান্তর ভরে দেবে।
আর এই ফতেপুর– ফতেপুর সিক্রি যার নাম
তারই মর্মমূল থেকে এ জাহান পেয়ে যাবে নূর–
তখন কোথায় আমি, কোথায়-বা ক্ষত্রবংশী তুমি
মানুষই তখন গান, মানুষই তখন ক্রবাদুর।

২৯

এবার আসোনি তুমি সাবলীল কালো জলাধারে
এবার আসোনি তুমি মেঘাতুর পাহাড়চূড়ায়
আমার গরিবজন্ম তোমাকেও করেছে গরিব
এবার বৃষ্টির দিনে বসে আছো চায়ের দোকানে।
ঘর করা হলো কি না বলে একজন, অন্যজনে
আজও খুঁজে ফেরে মুখ মিছিলে যা হারিয়ে গিয়েছে,
কারো মুখে ব্রণচিহ্ন, বঙ্গদর্শনের পাতা খুলে
ভাবে কোন্ আন্দোলনে নিশ্বাস ফেরাবে পৃথিবীর।
পথে জমে আছে জল, কথাও নামিয়ে আনে ভার
সারাৎসার উড়ে যায় চায়ের ধোঁয়ায়, তার পাশে
ধর্মজিজ্ঞাসার মতো চিহ্ন হয়ে বসে আছো তুমি
যেন সব ভুলে আছো দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ।

৩১
তোমারই ঠোঁটের দাগ এ-অসাড় পাথরে পাথরে
ফসিলের ফুল হয়ে ফুটে আছে পাণ্ডুরেখাজালে
কারা তার মাঝখানে বর্শাফলকের দিন খুঁজে
মুখ গুঁজে পড়ে আছে যেখানে ইটের প্রহেলিকা।
আমি দূর থেকে দেখি নেশায় বিকল কটা চোখ
স্বপ্নের ভিতরে শুধু শুনি তার ওম্ ওম্ ধ্বনি
শয়ে শয়ে ধুনিজ্বালা যেখানে হলুদ কুয়াশাতে
পাখিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াআড়ি আত্মঘাতকামী
আর তার মাংসখণ্ডে ভরে থাকে আদিগন্ত মাটি
সরযূর টানও তাকে ভাসাতে পারে না, সেই স্রোতে
আমরা যে কথা বলি আমরা যে গান গাই, তার
তোমার বুকের ক্ষতে অন্য কোনো মানে আছে আর?

৩২
ডানায় রক্তের দাগ, উড়ে তুমি কোথা থেকে এলে
এই অশথের নীচে দুদণ্ড জিরোও, এর নীচে
কোনো ক্লান্তি ক্লান্তি নয়, কোনো ক্ষোভ নয় কোনো ক্ষোভ
তোমারও তো শেষ নেই, তুমি কেন ভাবো অপারগ?
ওরা এর মসৃণতা হাতের পাতায় পেয়ে গেছে
ওরা এর রক্তিমাভা তুলে নিয়ে মেখেছে শরীরে
হৃৎপিণ্ডে তীর আর দুচোখে উড্ডীন নিয়ে ওরা
কতদিন কতরাত তোমার প্রসারে চেয়ে আছে।
ডানার সীমানা নেই, নাশকের নিশানা পেরিয়ে
কোথায় তোমার বাড়ি কোথায় তোমার দেশগাঁও—
গ্রহতারকার নীচে পড়ে আছে সজল সময়
বুকে হাত দিয়ে বলো আজও তাকে কতখানি চাও।

৩৬
সব চোখ মেলে দিয়ে এ বাতাসে জড়িয়ে ধরেছ
তুমিই আগুন তুমি জল তুমি আকাশ বা মাটি
শরীরে শিহর তুমি মনে আমরণ আরাধনা
অমৃত পাহাড় থেকে সাগরের তরল গরল।
পুরোনো বছরগুলি ফুলের স্তবক নিয়ে প্রায়

পায়ে পায়ে হেঁটে যায় পার্ক স্ট্রিট থেকে গড়িয়ায়
আর তার মুক্তদেশে সোনালি সপ্তর্ষিরেখা রেখে
গভীর প্রান্তরে ঝুঁকে যখন এ ওকে চুমু খায়
তখনই শূন্যের থেকে ঝাঁপ দেয় লক্ষ লক্ষ তারা
তখনই অশথপাতা হাওয়ায় হাওয়ায় মাতোয়ারা
তখনই উৎসের থেকে নেমে আসে প্রলয়ের জল
তখনই গন্ধর্ব তুমি খুলে দাও মাটির আগল
আমার শরীরে তার ছোঁয়া লেগে থাকে অবিরল
আমার শরীরে সেই ছোঁয়া লেগে আছে অবিরল
আমার শরীরে সেই ছোঁয়া লেগে আছে অবিরল

গ্রহণ

দুপুরের হলকা লেগে থেমে থাকে মুহূর্ত সময়
এ চোখ যা দেখেছিল
তা এর দেখার কথা নয়।

আহ্নিক আবর্তে ঘোরে মাথা আর বুকে পোড়ে পাখি
ঘর কিছু আছে বলে
সত্যি তুমি ভেবেছিলে না কি?

দাঁড়ানো মিথুনমূর্তি ধরেছে হরিৎ হলাহল
খোলা আকাশের নীচে
খসে আছে চিরায়ত ফল।

দুদিন বিলাপ হবে তারপরে ভুলে যাবে সব
তবে কি খড়েরই কাছে
আমার এতটা পরাভব!

ঘুমিয়ে পড়েছে হাত, ফুরিয়ে গিয়েছে বীজ বোনা
এই গ্রহণের দিনে
ভাবি আর কিছু দেখব না।

আমার মেয়েরা

লিখে যাই জলের অক্ষরে
আমার মেয়েরা আজও অবশ ভিক্ষার হাতে পড়ে আছে সব ঘরে ঘরে।

থাকা

এর কোনো শেষ নেই, এ আবাদ, এই জলাজমি
এই রাত দুপ্রহরে ঢল, এই বানভাসি ভোর
উদোম কিশোর আর কিশোরীর মাথাগোঁজা পাঁকে
এই গেঁথে থাকা, এই করুণায় দুহাত বাড়ানো।
এর কোনো শেষ নেই, তোমাদের এই আসা যাওয়া
গলিত হাতের মুঠো খড়কুটো ভরা আছে ভেবে
এই ভেসে ওঠা এই বেঁচে থাকা অশনেবসনে
ঝিম হয়ে বসে থাকা কাক আর কাকের আকাশ।
এর কোনো শেষ নেই পানের বরজে ঢেকে থাকা
গ্রামগুলি দুই পাশে পড়ে থাকা এই ভাঙা ডানা
ঠোঁটে লেগে থাকা রস, বুকের উপরে চলা চাকা,
চাকার উপরে শব, শবের উপরে শামিয়ানা—
এর কোনো শেষ নেই, মাথায় কুয়াশা মাখা ভোরে
দেশের ভিতরে বন্দী দেশও ঘুমায় অকাতরে।

অবলীন

যে দূর দূরের নয়, যে দূর কাছের থেকে দূর
যে আকাশ ভরে আছে আকাশের ভিতরে বিধুর
যে স্বর স্বরের চেয়ে শরীরের আরো কাছাকাছি
আমার ভিতরে আমি ক্ষীণ তার প্রান্ত ছুঁয়ে আছি।
যে তুমি তোমারও চেয়ে ছড়িয়ে রয়েছ অবিনাশ

যে তুমি পাথরে ফুল যে তুমি সজলে ভাসো শিলা
কালের আহত কাল তুলে নিয়ে যায় তার শাঁস
এতদিন সয়ে থেকে তার পরে ছিঁড়ে যায় ছিলা
ঘুমের ভিতরে ঘুমে পড়ে থাকে ডানাভাঙা হাঁস
পাটল প্রবাহে তবু অবিকল জাগে এক টিলা–
আমি সেই স্তবে ভরা নীরব পলের পাশাপাশি
কিছুই-না-এর প্রেমে অবলীন ধীর হয়ে আছি।

বিশ্বাস

আমার বিশ্বাস আছে আমাকে বিশ্বাস করো তুমি।
আগুন কখনো তাই সততায় ডাকে না আমাকে।
যত দূরে যাই দেখি তোমার মুখর মুদ্রাগুলি
ঘরের শিয়রে, পথে, জাদুঘরে, জলের প্রবাহে।
তোমার হৃদয় কোনো অথর্বতা জেনেছে কি আজ?
নিঃস্বতায় মুছে গেছে হৃদয়ের কালাকাল সীমা?
জাগো, জেগে ওঠো, জাগো, অন্ধকার জাগরণে জাগো–
আমাদের পৃথিবীতে কখনো ফেরে না হিরোশিমা।
তোমার বিশ্বাস নেই তোমাকে বিশ্বাস করি আমি?
এই ঘূর্ণিচরাচরে আমার সমস্ত রাত্রি ঘিরে
মুনিয়ার ডানা সব ঝরে গেছে আণবী ছটায়–
তোমাকেই খুঁজি তবু শরীরেরও ভিতরে শরীরে।

মেঘ

মেঘ আমাদের জন্য এনেছে সহজবোধ্য বাড়ি।
আজ এই কালো ভোরে সেই দেশে চলে যেতে পারি
স্তূপের সমস্ত দিন ফেলে রেখে। কে কাকে ধরতে পারে আর।
এক বিদায়ের থেকে আরেক বিদায়ে পালাবার

মাঝখানে পড়ে আছে সরলরেখার জানুবৎ
পথ, আর তার শেষে দুশো বছরের বুড়ো বট
বলে, এত ভয় কেন, আয় এইখানে এসে বোস–
মেঘই আমার জন্য এনে দিল প্রথম সাহস।

পরিখা

'কিছুই যা বোঝা যায় না তার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে
আমার সুলগ্নে এসো। এর কোনো কণামাত্র কমে
আমাকে পাবে না তুমি। আমি এ ঘুমের প্রান্ত ছুঁয়ে
সেই কোন্ আদিমধ্য কাল থেকে পড়ে আছে একা–
এক লহমায় আজ সে কি এত মিথ্যে হতে পারে?
আমার হৃদয় আজও নভকণিকার আলো থেকে
তোমাকে সৌরভ দেয়– দিতে পারে– যদি তুমি জানো
আমার শরীরে এসে লগ্ন হতে একাকার জলে।
কিন্তু এই অবেলায় তোমার মুখের দিকে চেয়ে
আজ আমার মনে হয় তুমি ভুলে গেছ সেই টান
তোমার বুকের কাছে কোথাও এ আউশের ধান
রাখে না পীতাভ ছোঁয়া। তবে কি তর্পণ হাতে নিয়ে
নিজেরই দক্ষিণ দ্বারে হাঁটু মুড়ে বসে আছো শুধু?
আমি কেন আছি তবে? আমি তবে বেঁচে আছি কেন!'
–এই কথা বলেই সে আমার পাথরে চাপা ধ্যানও
ভেঙে দিয়ে চলে গেল পরিখার ওপারে ত্বরিতে–
আমার নিস্তার আমি তখনই পেরেছি তাকে দিতে।

ছেলেধরা বুড়ো

কলেজ স্ট্রিটের পাশে বসে আছে ছেলেধরা বুড়ো।
পুরোনো অভ্যাসবশে দুচোখ এখনও খুঁজে ফেরে

যেসব ধমনী ছিল এ-পথের সহজ তুলনা
ঈশান নৈর্ঋত বায়ু কখনো-বা অগ্নিকোণ থেকে
যেসব ধমনী ছুঁয়ে পৃথিবীও পেত উত্থান
রূপের ঝলক লেগে সে কি এত মিথ্যে হয়ে গেল?
উপমার মৃত্যু হলো এই নবদূর্বাদল দেশে?
বুড়ো তাই গান গায়, থেকে থেকে বলে 'আয় আয়'
লোকেরা পাগল ভাবে লোকেরা মাতাল ভাবে তাকে
ঢিল ছুঁড়ে দেখে তার গায়ে কোনো সাড় আছে কি না
সে তবু গলায় আনে নাটুকে আবেগ, হাঁকে 'এই
শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে যেন–'
আর সেই মুহূর্তেই বৃষ্টি নেমে আসে তার স্বরে
চোখের কুয়াশা ঠেলে দেখে তার চারপাশে সব
যে যার দিনের মতো ঝাঁপ ফেলে চলে গেছে ঘরে
পুরোনো অভ্যাসে শুধু বুড়োর পাঁজরে লাগে টান–
যদিও বধির, তবু ধ্বনিরও তো ছিল কিছু দেনা
সবই কি মিটিয়ে দিয়ে গেল তবে রণবীর সেনা?

ঘাতক

মনে হয়েছিল গলিতে গলিতে তোমাদের দেখা পাব
মনে হয়েছিল সান্ধ্য গঙ্গা ভরে যাবে কিংখাবে
মনে হয়েছিল বাঁ পাশে দাঁড়ানো অশ্বত্থের টানে
একবার এসে পৌঁছলে কেউ ফিরবে না হীনভাবে–
হয়তো তো ভুল, হয়তো সেসবই বলেছি জ্বরের ঘোরে
ট্রাফিকের চাপে শবানুগমন থম্‌কে পথের মোড়ে।

কথা দিয়ে কথা মুখ ঢেকে রাখে, আর সেই সমারোহে
দিন আমাদের কিছুই বলে না, রাত্রিও খুব বোবা–
কপালের কাছে ছাই উড়ে এলে বিভূতিই ভাবি তাকে
চণ্ডাল এসে দাঁড়ায় কখনো, ফিরে যায় কখনো-বা,
ফুটপাথে শুধু ভিখিরিরা শোনে আকাশবাণীর রব
আমাদের কাঁধে লীন হয়ে আছে দহনোন্মুখ শব।

কে ওকে মেরেছে? সেকথার কোনো উত্তর নেই আজ
এ-মুখে ও-মুখে তাকিয়ে এখন চুপ করে থাকা শ্রেয়।
আমি কি জানি না আমিই যে সেই ঘাতক? অথবা তুমি
তুমি কি জানো না তুমিও যে সেই ঘাতক? অথবা সেও
সেও কি জানে না তারা সবাই যে ঘাতক? কিন্তু তার
চোখ আজও আছে পথ চেয়ে কোনো অবোধ বন্ধুতার।

ঘুমের ভিতরে মনে হয়েছিল নাম জানি আমি তার।

জলেভাসা খড়কুটো : প্রথম গুচ্ছ

১
ঢালু পাড় ভেঙে নেমে আসবার সময়ে
হারিকেন যেখানে জ্বলছিল
থেমে যায় ধর্ম
শিকড়বাকড়েরা নিশ্বাসে নিশ্বাসে কথা বলে ওঠে
যেন কতদিনের জানা
পায়ের সামনে এসে দাঁড়ায় ছইহারা নৌকো
চুপ করে থাকে বৈঠা
এই মাঝির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের অনেকদিন আগে
অথচ একদিন বুঝবে কথাটার কোনো মানেই নেই।

২
মনে করার কথা কিছুই আর বলব না
তোমার গাঁথুনি আমার জানা হয়ে গেছে
এই তো? শুধু এইটুকু?
সবচেয়ে ভালো তবু সুপুরিটানের দোহারা দাঁড়ানো
আর রেখাদোলানো এই ছলছলে জলে
কেঁপে ওঠা অবৈধতা।

৩
কেন আমাকে মানতে হবে তোমার নিয়ম?
দুই পাড় ভেঙে
দেখেছি তারও মধ্যে বসতি করে মানুষ
কথাও চলে এপার ওপার
চিৎসাঁতার না ডুবসাঁতার
ভালো করে ভাবার আগেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ছি
টইটম্বুর জলে।

৪
মেঘনার মতো তার শরীরে আদুল শুয়ে আছি।

৫
জন্ম জন্ম কথা বলে যাব।
নীরবতার মধ্যে জেগে উঠছে ভাপ
কামড়গুলি সব পথে পথে লুটোয়
তার থেকেই জন্ম নেয়, জন্ম নিতে থাকে, সরু সরু ঘাস
আর তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে
শেষ হয়ে যায় আমার সর্বস্বহারা অপঘাত।

৬
বৃষ্টির শব্দ জানবে তোমার ঘর।
শহরের হেলাফেলা মুছে নিয়ে কতদূর যে ঘুমিয়ে পড়তে পারি
তার চিহ্ন থাকবে এখানে, এইখানে।
তুমিও জানো
কোনো কাজের মধ্যে নেই আমি, অকাজেও না।

৭
গান গাইবার সময়ে তোমার গলার শঙ্খদাগে
যখন ঢেউ লাগে
আর সুরের কালো হাওয়ায় যখন ঘুমিয়ে পড়ে সবাই
নাম-না-জানা দুটোমাত্র তারা ছাড়া আর সবাইকেই যখন ঢেকে নেয় মেঘ
হিম পড়ে ইতিহাসের পাতায়
খোলা ছাতের সেই অন্তরাতে
বোলো, তুমি বোলো।

জলেভাসা খড়কুটো : দ্বিতীয় গুচ্ছ

৮
ভরাট আঙুরের মতো এক-একটা গাঁয়ের নাম।
আমরা এসে পৌঁছলাম নান্দিনায়।
বলিনি তোমার ভালো লাগবে?
কুড়ি কুড়ি বছরের পাড়ি ভেঙে
নতুন পৈঠা
কতদিনের না-বলা নিয়ে বসে থাকবে এখানে
অজচ্ছল ভেসে যেতে যেতে সবাই একদিন ভুলে যাবে
আমরা ছিলাম।

৯
নিমফুলের আলো এসে পড়ছে তোমার ভোরবেলাকার মুখে
কোথায় যাবে সেই ভিনদেশী মানুষ
চায়ের জন্য খুচরো গুনতে গিয়ে যার হাত থেকে
খসে পড়ে বটচারা
আর ধুলোয় নিচু হয়ে যে দেখতে পায়
তোমার মুখের আদলে ভরে গিয়েছে গোটা দেশ।

১০
যদি আমিই না দেখতে পাই কে আর বলবে তোমার কথা।
ওই বৃন্তের প্রস্ফুরণে
চুমুক দিয়েছিল অন্ধকার
আর তার থেকেই পাকে পাকে ভেঙে যাচ্ছিল বাঁধ
পিচ্ছিলতার দিকে গড়িয়ে যাবার আগে
আমার চোখেমুখে তোমার মসৃণ পাটক্ষেত।

১১
আর তাছাড়া, ওরা বলছিল
ভালোবাসা কথাটার গায়ে ঝুলে আছে মৌচাক।

১২
কথাটা ঠিক তা নয়, বলতে গিয়ে ভুলে গেলাম।
আলে-থেমে-থাকা জল থেকে ছেলেমেয়েরা খুঁটে তুলছিল মাছের কণা
তাদের মুখের প্রতিবিম্বে
একলহমা থমকে গিয়েছিল সর্বনাশ
আর, যদিও তুমি কোথাও ছিলে না
আমার আঙুলে এসে কেঁপে যাচ্ছিল তোমার নক্তক্ষত আঙুল।

১৩
শহরের কামড় আমার ঘাড়ে
চোখের ঢালুতে কালো দাগেরও মানে আছে
পাঁজরগুলি নরম হয়ে আসছিল যেন খসেপড়া পালক।
তাহলে তো তোমার কথাই সত্যি হলো
আর আমিও যে জানি না তা নয়
মটরদানায় ভিজে ঠোঁট রেখে
শুয়ে থাকতে থাকতেই শরীর কুয়াশা হয়ে গেল।

১৪
ওই ভুরু, ক্ষীণ পক্ষ্মপাত
এতদিন পরে এই দ্বাদশীতে এলে
তুমি এলে
শূন্য থেকে শূন্যে ঝরে রুপোলি প্রপাত।

১৫
না-ই যদি হতো? ধরো, যদি না-ই হতো?
পলিমাটি দিয়ে বানিয়ে তুলছিলাম মুখ
কত অপমানের চিহ্ন, কত ভুলবোঝার
বিন্দু বিন্দু করে গেঁথে দিচ্ছিলাম
তবু ওই মুখ কেবলই জেগে উঠছিল, জেগে থাকছিল
উপকথার মতো
বৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তে গড়িয়ে যাচ্ছিল
আর তার আবছায়ায়
বোকা হয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগছিল আমার।

জলেভাসা খড়কুটো : সপ্তম গুচ্ছ

৪৮
তবে কি সম্পূর্ণ হলো দেখা?
এবারে সম্পূর্ণ হলো দান?
ও-দেশের জলধারা এসে
এ-নদীতে করেছে প্রয়াণ–
তুমি কেন আধখানা প্রেমে
যুবাদের মতো ম্রিয়মাণ?

৪৯
যতদূর পিপাসাতে এ-শরীর সাড়া দিতে পারে
আগুন জ্বালিয়ে যাও ততদূর পাতায় পাতায় তুমি সানুমূলে পাইনের বন।

৫০
রাতের পেয়ালা শেষ হলে
দেবতা ভোরের আলো খান
আঙুল এখনও বিজড়িত
পুতুলে লাগেনি আজও টান
নিঃশেষের কাছে এসে গেলে
অপ্রেমিকও প্রেমিকসমান।

৫১
কে তোমার কথা শোনে? তুমিই-বা শোনো কার কথা?
তোমার আমার মধ্যে দু-মহাদেশের নীরবতা।

বিষণ্ণকরণী

রাত্রির ভিতরে এসে আরো রাত্রি মিশে যায় যদি
অন্ধকার থেকে যদি জেগে ওঠে আরো অন্ধকার
সমস্ত মুখের থেকে মুখরতা মুছে যায় যদি

তোমার আমার মধ্যে ভেসে যায় সব পারাপার
প্রত্যেক মুহূর্ত যদি নিয়ে আসে বিষণ্ণকরণী
প্রত্যেক অতীতবিন্দু ভরে দিয়ে ভবিষ্যৎজলে
কথা যদি থেমে যায় কথা যদি দৃষ্টি হয়ে যায়
প্রত্যেক শরীর যদি শরীর-উত্তর কথা বলে
রাত্রির ভিতরে তবে আরো রাত্রি মিশে যাওয়া ভালো
অন্ধকার থেকে ভালো আরো অন্ধকার জেগে ওঠা।

তবে কি তোমাকে আমি সত্যি কথা বলিনি সেদিন?
অপমানক্ষতগুলি স্তোক দিয়ে ঢেকে রেখেছি কি?
ছড়ানো সমস্ত বর্ণ স্তব্ধতা ছড়িয়ে রাখে যদি
শব্দ দিয়ে কীভাবে-বা কেবলই তোমার কথা লিখি?
ছন্দের ভিতরে তুমি, ছন্দ যদি না-ও থাকে, তুমি
তুমিই শ্মশান আর তুমিই নিবিড় জন্মভূমি
রাত্রিগুলি মিশে গিয়ে গড়ে তোলে যে-মূর্তি তোমার
সব অন্ধকার মিলে তোমার যে দৃষ্টি দেয় ভরে
সেই মূর্তি সেই দৃষ্টি ভাষা পায় রতিময় ঘরে
'শিরোনামে নয়, তুমি নেমে এসো পঙ্‌ক্তির ভিতরে।'

পক্ষাঘাত

একদিন আমরাও এই মাটিজলে ছিলাম, যেখানে
প্রত্যেক মুহূর্ত তার পক্ষাঘাতে মরে যেতে যেতে
হঠাৎ জাগর হতো, আর সেই জাগরণপলে
ভেসে আসত কত গুল্ম, কতই নক্ষত্র, কত তিথি
আয়নমণ্ডল ভেঙে নীলাভ বিপুল আলো এসে
অদৃশ্য নাচের টানে ভরে দিত শরীরমণ্ডল।
তার পরে আর কেউ অন্য কারো মুখে তাকাত না
এক খণ্ড শুয়ে থাকত আরেক খণ্ডের বিপরীতে—
এ-রকম ভ্রান্তি ছিল। লাঞ্ছনায় ছিন্নভিন্ন বুক
পড়ে থাকত রাজপথে— জনহীন নৈশ রাজপথে।
ভোরে তবু তারই তাপে ফুটে উঠত সূর্যমুখী ফুল

একটাদুটো কবিতা-বা। সারাদিন জেগে থেকে তারা
আবার ধ্বংসের দিকে মুখ রেখে দাহ নিতে নিতে
মরে যেত পক্ষাঘাতে ঈশ্বরের ভার বুকে নিয়ে
বলে যেত মনে রেখো, আমরাও ছিলাম পৃথিবীতে।

কথার ভিতরে কথা

সকলে না, অনেকেই কথার ভিতরে কথা খোঁজে।
সহজের ভাষা তুমি ভুলে গেছ। এই বৃষ্টিজলে
এসো, স্নান করি।
জলের ভিতরে কত মুক্তিপথ আছে ভেবে দেখো।
অবধারিতের জন্য বসে থেকে বসে থেকে
আরো বেশি বসে থেকে থেকে
হৃদয় এখন কিছু কুণ্ঠন পেয়েছে মনে হয়।
তবে কি তোমার কোনো নিজস্ব গরিমাভাষা নেই? কেন আজ
প্রত্যেক মুহূর্তে এত নিজের বিরুদ্ধে কথা বলো?

এখনও সে

এখনও কীর্তনখোলা? এখনও কি আছে সেই নাম?
তেমনই প্রবাহমুখ? এখনও কি সে-রকমই আছে?
সে-রকম নেই আর, সে-রকম থাকারও কথা না।
বহু তরণের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, মুড়ে দিয়ে ডানা
আরেক রূপের দিকে জলবতী আজও তার গান
সময় বেষ্টন করে পড়ে আছে। দেখেছে আমাকে?
সেকথা ভাবিনি আর এই দুপুরের দেশে এসে
মনেও রাখিনি ঠিক সে আমাকে মনে রাখে কি না
আমার শরীর শুধু জেগে ওঠে তার কাছে গেলে।

মঠ

তোমাকে পাই না আর তোমার সম্পূর্ণ কাছে গেলে
জল যদি যায় যাক রূপসা থেকে কীর্তনখোলায়
সে-জলের নাম আজ মনে পড়ে বহুদিন পরে
সে-জলের নামে আজ রক্তিমা পেয়েছে অবসাদ।
তুমি এসে তার ধারে দাঁড়িয়েছ সুপুরির সারি
তোমার মাটির কাছে পড়ে আছে পঞ্চাশ বছর
সে-মাটির নাম আজ মনে পড়ে বহুদিন পরে
সে-মাটির নামে আজ বয়স ভেঙেছে সব বাঁধ।
তবুও তোমার কাছে যাবার পাইনি কোনো পথ
তোমার হৃদয় আজ হয়ে আছে হৃদয়ের মঠ।

সন্ধ্যানদীজল

দুহাত তোমার স্রোতে, সাক্ষী থাকো, সন্ধ্যানদীজল।
এমন দর্পণদিনে বহু মঠ পেরিয়ে পেরিয়ে
তোমার দুঃখের পাশে বসে আছি এই ভোরবেলা।
আরো যারা এ-মুহূর্তে নেই হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে
আমার শরীর ঘিরে এমন সম্পূর্ণ যবনিকা—
তাদের সবার শ্বাস দুহাতে অঞ্জলি দিয়ে আজ
এইখানে বসে ভাবি আমার সম্বল স্থির থাকা।
আমার সম্বল শুধু ঝুমকোঘেরা মঠ অবিকল
আমার নদীর নাম সন্ধ্যানদী, তুমি তার জল।

ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার

পরিধির পাশে বসে তুমি কি আমার অসম্ভব
ইচ্ছেগুলি জানতে পাও? কিংবা এই বৃত্তের ভিতরে
আমার মুখের রেখা দেখে কোনো খরার ফাটল
টের পাও কোনোদিন? পরিপাটি নুড়িতে শিকড়ে
পাক খেয়ে ঘুরে আসে অ্যাকুয়ারিয়ামে ভাসা মাছ–
তুমি কি আমাকে ভাবো তোমারই আরশির ভাঙা কাচ?
এত এত গণ্ডি টেনে অনড় করেছ দুই পা
যা কিছু সহজে আসে তাকেই বলেছ শুধু 'না'
কিছু শব্দ কটা দিন উচ্ছলতা পায় মুখে মুখে
তার পরে মরে যায়, আমরা তার শব নিয়ে ঘুরি
দুহাতে তাকেই তুমি সাজাও যে রাগে-অনুরাগে–
ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার জেনেছ কি আগে?

মহাপরিনির্বাণ

ভালো তো লাগেই। কিন্তু তবুও সে-লাগার পিঠোপিঠি
ভিতরে কোথাও জমে থাকে কিছু অপ্রস্তুত স্মৃতি।
গানের ভিতরে জাগাব শরীর, শরীরের বুকে গান
বহুদিন হলো সে-মিলন থেকে মহাপরিনির্বাণ।

ভেবেছি আমার যা-বলার বলি, শোনা সে তোমার খুশি
ভেবেছি যে বলি যেয়ো না ওখানে। সাফল্য-রাক্ষুসি
গিলে খেয়ে নেবে আদ্যোপান্ত। বিশ্বাসে ঝলমল–
তোমাকে কি আর মানায় এসব? ছাড়ো এ সভাস্থল।

ছাড়োনি তবুও। ভুলে গেছ গীতপঞ্চাশিকার রাত
প্রতিবাদহীন মুক্ত বাজারে বজায় রেখেছ ঠাট।
চেয়ে তো ছিলাম ছন্ন কপালে জলতিলকের ফোঁটা
তোমার দুচোখে দেখি আজ শুধু প্রত্যুৎপন্নতা।

চক্ষুষ্মতী, তার কবিকে

বেঁচেই তো থাকতে চাই, ইচ্ছে তো করে না অন্ধ হতে–
তবু যদি কোনোদিন হয়ে যাই, তাই এত আগে
এখানে এঁকেছি চোখ, এই দীর্ঘ কৃষ্ণচূড়াবীজে–
এ চোখ তৃতীয় চোখ, এই চোখ আপনাকে দিলাম।
আপনাকে দেখলেই বেশ বোঝা যায় বজ্রাহত বাড়ি
ভিতরে সমস্ত ঘর বেঁকে পুড়ে খাক হয়ে আছে।
আপনি কি কখনো একটু একা হন না? হতে ভয় করে?
আপনার ঝিনুক হতে ভয় করে? অথবা নুলিয়া?
চলুন, আপনাকে নিয়ে চলে যাই বঙ্গোপসাগরে
ডুবোপাহাড়ের মতো সেখানে আপনার পাথরেরা
জলের ভিতরে খুব চুপ করে বসে থাকবে একা
শীর্ষও থাকবে না তার, তার থাকবে প্রসারণ শুধু,
বুকের গহ্বরে শুধু ঢেউ দেবে মাছের রুপোলি
কিংবা হয়তো কোনোদিন কোনো এক পৌরাণিক তিমি।
তখন আপনার মধ্যে কত ইতিহাস জমে যাবে
কতই চণ্ডালচিহ্ন নীলিমার গায়ে গায়ে লেগে
ছুঁতেও পারবে না কেউ বহুযুগনিরুদ্ধ ফসিল–
তখন আমিও যদি কোনোদিন অন্ধ হয়ে যাই
আমার তৃতীয় চোখ আমাকে তো ফিরিয়ে দেবেন?

বন্ধুকে বন্ধু

বারে বারে একই কথা শুনতে কিছু ভালো লাগে তোর?
লাগে না যে, জানি সেটা। তবু এত বলে যেতে চাই।
তোকে দেখলে মনে হয় বিজন প্রান্তরমধ্যে চার্চ
তার শ্বেত স্তব্ধতায় আমার সমস্ত কনফেশন।
যেকথা মেঘেরও দিনে আদিতমা নারীকে বলিনি
যেকথা অনেকদিন ভার হয়ে ছিল এ জীবনে
যেকথা ইড়ায় শুধু সরস্বতী হয়ে বয়ে যায়

ঝর্না করে তাকে আজ ঢেলে দিতে চাই তোর কাছে।
বলে যেতে চাই আমি কীভাবে ফিরেছি ঠোঁট চেপে
কীভাবে নিজেকে আমি হত্যা করে গেছি প্রতিদিন–
হৃৎপিণ্ড হাতে নিয়ে কীভাবে লুকোনো কুঠুরিতে
বলেছি, এখানে থাকো, কোনো শব্দ কোরো না কখনো–
আর সেই হৃৎপিণ্ড আমার কঙ্কাল ছুঁয়ে থেকে
অর্থহীন আর্তনাদ করে গেছে বর্ষ মাস দিন!
সেই হত্যা গান গায়, সেই হত্যা অন্ধকারে হাসে
সেই হত্যা ভস্মাধারে গড়ায় সমস্ত ইতিহাসে
বেরোবার সব পথ সেই হত্যা করেছে আটক–
কেননা নিজের কাছে নিজে আমি বিশ্বাসঘাতক।

রক্তের দোষ

বিশ্বের প্রভু কে সে তো সকলেই জানে, আমরা ঋণী
সে-মহাকেন্দ্রের কাছে। তারই থেকে আলো এসে পড়ে
আমাদের মাংসে, হাড়ে ; আমাদের শোকে ও সংগমে
নিজেদের মানে আমরা তাকে ছাড়া বুঝতেও পারিনি।
সে যদি না শুনতে পেত আমাদের চমকপ্রদ বাণী
যদি না বাহবা দিত তাথই বিভঙ্গে তালি দিয়ে
তাহলে কোথায় আমরা কোথায়-বা আমাদের স্বর–
বিপথেই ঝরে থাকত গলে-যাওয়া মজ্জা সবখানি!
সেই আমরা আছি তাই দেশ তবু বেঁচেবর্তে আছে
মানচিত্রে ভেসে উঠে পেয়ে গেছে তবু কিছু মান।
আর ওকে দেখো আজও অকাতরে আপন ভাষায়
গাঁয়ে বসে খুঁটে খায় খুদকুঁড়ো, অথবা বিজনে
হাঁটু ভেঙে পড়ে থাকে আলপথে গরমে বা শীতে–
রক্তে তো ইংরেজি নেই, বাঁচবে কীভাবে পৃথিবীতে!

শিল্পী

অর্ধেক রাত্রির মুখে আলো এসে পড়ে
অর্ধেক নিজের কাছে স্তব্ধ হয়ে আছে–
তুমি আজও দিশেহারা, জানো না এখনও
তারারা কোথায় মরে কোথায়-বা বাঁচে।

কখনো-বা হেঁটে যাও নিছক বামন
সমস্ত শরীর শুধু শব্দ দিয়ে ঘেরা,
জাগ্রত বসন্ত পেয়ে শিয়রের পাশে
কখনো-বা অতিকায় নিজেরই প্রেতেরা।

ধ্বনি আর রঙে মিলে নিরঞ্জন শ্বাস
কিছু উড়ে চলে যায় কিছু পড়ে থাকে–
নিজেকে কি জানো তুমি? কতটুকু জানো?
তুমি তা-ই, মিডিয়া যা বানায় তোমাকে।

অপমান

গান মুহূর্তে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে
চারদিকে এত জম্পেশ খেলাধুলো
এরই মাঝখানে বয়ে যেতে হবে বলে
কানে তুলো আর পিঠেও বেঁধেছি কুলো।

তুমি ভেবেছিলে অপমান ছুঁড়ে যাবে
দুকথা শুনিয়ে সুখ পাবে ভেবেছিলে
চোখের আড়ালে অশ্বত্থের ডালে
ভেবেছ দু-পাখি মরে যাবে এক ঢিলে।

মরেওছে বটে। তবে সে আমার নয়
আমার পাখি তো লুকোনো নৌকোজলে।

অবশ্য জানি যা-কিছু লুকোনো আজ
সবই পেতে চাও ছলেবলেকৌশলে।

'লজ্জাও নেই নিজের ও-মুখ দেখে?'
বলে ফোন রেখে দিয়েছ ঝনাৎ করে।
এ-বিষয়ে আর বেশি কিছু বলব না
যা বলার শেষ বলেছি একাক্ষরে।

খুবই দেখেশুনে বৈঠা বাইতে হবে
ওত পেতে আছে ঘাটে ঘাটে ঘড়িয়াল—
কবিতায় যদি গল্প লুকোনো থাকে
টপ করে তাকে গিলে নেবে সিরিয়াল।

ঈশ্বরী

যখন বরফে সব ঢেকে আছে, তুমি একা জেগে
যখন বিকল স্মৃতি, মনেও পড়ে না কে কোথায়
এইখানে টিলা ছিল ওইখানে ছিল বুঝি লেক
আজ সব শ্বেতাভায় কালো শুধু তোমার কালিমা
যখন শপথ মানে কেবলই শ্বাসের অপঘাত
যখন জীবন মানে কেশর, নখর, আর দাঁত
যখন নিজেকে শুধু মনে হয় তুষারের হিমে
ঝরে-যাওয়া জমে-যাওয়া নিরুদ্দেশে মরে-যাওয়া পাতা
যখন ধ্বংসকে আরো ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হয়
এমনকী মুছে যায় সমস্ত অতীতকাতরতা—
তখন ও মেয়ে, মেয়ে, তখন কি মনেও পড়ে না
এ কেবল স্থানবিন্দু এ কেবল কালবিন্দুটুকু
মনে কি পড়ে না এই বিন্দু ভেঙে তোমার হৃদয়
শূন্য আলিঙ্গন করে নিজেই ঈশ্বরী হতে পারে?

সবুজ ছড়া

উত্থান– তার শেষ নেই কোনো, শেষ নেই দস্যুতার,
ভোরের বেলায় শূন্যে উঠেছে পরশুরামের কুঠার।
ত্রিসীমায় কোনো সঞ্চার কেউ রাখবে না কোনোভাবে
যেখানেই যত সবুজ রক্ত সবটুকু শুষে খাবে
নিঃসাড় করে দিয়ে যাবে সব সেগুন শিমুল শাল
আজ যাকে বলো বনভূমি তাকে জনভূমি বলো কাল।
নান্দীমুখর দশ দিগন্ত হারিয়ে ফেলেছে খেই
মনে হয় এই জীবনে কোথাও কোনো প্রতিরোধ নেই
সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এসে দিশাহীন প্রাঙ্গণে
পঁচিশটি মেয়ে পঁচিশটি গাছ বেঁধেছে আলিঙ্গনে।

পঁচিশটি মেয়ে পঁচিশটি শিখা জড়াল আলিঙ্গনে
পরাদৃশ্যের মাঝখানে ওরা আশ্বাসে দিন গোনে
বাকলে বাকলে জড়িয়ে গিয়েছে পঁচিশ মেয়ের প্রাণ
শরীরের প্রতি রোমকূপে জাগে বড়ে-গোলামের গান
সামনে কেবল স্থির থেকে যায় রোদ্দুরে ঝকঝকে
উদ্যতফলা পঁচিশ কুড়াল, দূর থেকে দেখে লোকে।
দূর থেকে দেখে লোকে
ও-মেয়েরা যেন মেয়ে নয় ওরা টুনটুনি বুলবুলি
মেয়ে হয়ে আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে সমস্ত গাছগুলি।

শহিদশিখর

আমি এই শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে কথা বলি
আমি এই শালপ্রাংশু মধ্যরাত্রি থেকে কথা বলি
আমার মায়ের রক্ত হাতে নিয়ে আমি কথা বলি
হোলি খেলেছিল যারা আমার মেয়ের রক্ত নিয়ে
আগুন জ্বালিয়ে যারা শবের উপরে নেচেছিল
এই শেষ অন্ধকারে তাদের সবার কথা বলি

আর যারা চুপ ছিল যারা কিছু দেখেও দেখেনি
একাকার মনে যারা অনায়াসে ছিল অন্যমনে
দলের ভিতরে যারা দলবৃত্তে অন্ধ হয়ে ছিল
অথবা মৃতই ছিল– সেইসব প্রাক্তন হৃদয়ে
একমুঠো ছাই ছুঁড়ে পিছনে না চেয়ে ফিরে এসে
নক্ষত্রের ক্ষত বুকে রক্ষাবাহিনীর ব্যূহমুখে
এই শতাব্দীর শেষ ভূমিহারদের কথা বলি
বলি যে জাতক বীজে মাটির কেশর মেখে মেখে
এক মরণের থেকে আরেক মরণে যেতে যেতে
আমার আমির থেকে জেগে ওঠে আরো আরো আমি
আমিই শতাব্দী আমি আদিঅন্তহারা মহাদেশ
আমি এই শতাব্দীর শহিদশিখর থেকে বলি
মৃত্যুর ভিতরে আজ কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ
দেখো এ মৃত্যুর মধ্যে কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ।

জলই পাষাণ হয়ে আছে

তবে কি আমারও চোখে জল নেই? আমাদের চোখে?
তবে কি কেবলই এই সমুদ্রবাতাস ফিরে যায়
আমাদের বধিরতা নিয়ে?
আমাদের উদাসীন বধিরতা নিয়ে?

আমরা ততটা দেখে খুশি থাকি যতটুকু দেখে এ সময়
তার বেশি নয়।
ভালোবাসা শেখায় গণিত
সে শুধু বিশ্বাস করে অবিশ্বাস ছাড়া কিছু নেই
সকলেরই মাঝখানে বসে খুব অনায়াসে
সকলকে গ্রাস করা চলে–
এত শিলাপাথরের ঘেরে কালো হেসে
তুমি বলেছিলে চোখে জল নেই, আমাদের চোখে।

কখনো দুপুররাতে যখন পৃথিবী শবাসীনা
পাশেও ঘুমন্ত মুখে কোনো আভা যখন দেখি না
যখন শোকেরও মধ্যে মিশে থাকে এতখানি ঘৃণা
তখন সেকথা মনে পড়ে।
মনে পড়ে অলৌকিক তারারা জমেছে কোণে কোণে
বাজনা উঠেছে বেজে– কে কোথায় শোনে বা না-শোনে–
সত্য আর মিথ্যা এসে বিবাহে বসেছে একাসনে
আকাশপাতালজোড়া ঘরে।

তবে কি আমারও বুকে এতটা পাথরজমা ভার?
ঠিক। ঠিকই বলেছিলে তুমি, আজ
চোখে কোনো জল নেই, বুকের উপরে শুধু সেই
জলই পাষাণ হয়ে আছে।

সে অনেক শতাব্দীর কাজ

শিখর থেকে একে একে খসে পড়ছে তারা।
গহ্বরের দিকে গড়িয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করছে, 'বলো, কেন
কেন অসময়ে আমাদের এই বিনাশ?'
জানতে চাইছে শিলায় শিলায় ঝল্‌সে-ওঠা স্বর :
'আমরা কি তবে সত্য ছিলাম না আমাদের শব্দে?
আমরা কি স্থির ছিলাম না আমাদের স্পন্দে?
আমরা কি অনুগত ছিলাম না আমাদের স্বপ্নে?
তবে কেন, কেন, আমাদের এই–'

পায়ে পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন পাহাড়ের কিনারে। বললেন, 'শোনো,
ছোটো ছোটো সফলতায় অন্ধ
তোমরা সকলেই ছিলে নিজের ভিতরে রুদ্ধ।'
সকলের দিকে একে একে আঙুল তুলে তিনি বললেন, 'তুমি ভেবেছিলে
তুমি যতটুকু জানো তার চেয়ে বেশি কোনো জ্ঞান নেই আর
তুমিই পরম আর সমস্ত পূর্ণতা এসে তোমাতেই মেশে ভেবেছিলে
ভেবেছিলে নিমেষেই জিতে নেবে ধনধান্যে অবোধ পৃথিবী

কখনো-বা ভুলে গেছ গ্রাসে ভুলেছ সংসারসীমা
আর তুমি
যদিও তোমাকে আমরা আমাদের সকলেরই জানি
লালন করেছ তবু গোপন গোপন অতিগোপন তত-কিছু-গোপনও-না লোল
পক্ষপাত
আর আমি, তোমাকে বাঁচাব বলে অতর্কিতে মিথ্যাচারী, বুঝি
তোমরা কেউ জানোনি যে বহুদিন আগে তোমরা মৃত।'

গহ্বরে মিলিয়ে যায় স্বর। স্তব্ধ শ্বাস। তার পর
তিনি ফিরে তাকালেন আমাদের দিকে। বললেন, 'এবার
আসুন, এক শতাব্দী আমরা নীরব হয়ে দাঁড়াই।'

জাতক

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে কিন্তু আলো জ্বলেনি কোথাও
বটমূলের আবছায়ায় বসে আছেন শাস্তা
আমরা তাঁকে ঘিরে আছি মুখে ত্রাস শিরদাঁড়া ভাঙা
স্খলিত স্বরে আমরা বলছি কী দেখেছি কী শুনেছি
কীভাবে তিনি ভেঙে যাচ্ছেন ঊর্ধ্বতন পাহাড়শিলায়
এক-একটা পাথরে কীভাবে উড়ে যাচ্ছে এক-একটা শতক
সে-উৎক্ষেপ ঘিরে ঘিরে নেচে উঠছে ধর্ষকাম গোলন্দাজদের দল
আর কীভাবে তাকিয়ে দেখছি আমরা যেন কিছু আর করবার নেই
আমরা তাঁকে বলছি।

তিনি চোখ মেললেন আকাশে, সে-চোখে নির্বেদ
বাসায়-ফেরা পাখিদেরও আর শব্দ নেই কোথাও
তিনি বললেন : শোনো, আরেক জন্মের কথা বলি আমি।
একদিন, মধ্যরাত, তখন সবাই ঘুমের মধ্যে অচেতন
সোর উঠল বাতাসে
অন্ধকার জ্বলে উঠল হাজার হাজার মশালের শিখায়
শিখা হাতে ছুটে আসছে রক্তপায়ী তরুণেরা
তাদের কপালে উলকি, বুকে শুদ্ধশোণিতের উন্মাদনা

বিদ্যাপ্রাঙ্গণের দিকে ছুটে আসছে তারা, দশ মে উনিশশো তেত্রিশ,
ধুলোয় নামিয়ে আনছে ৎসাইগ মান আইনস্টাইন রেমার্ক
ধুলোয় নামিয়ে আনছে জোলা জিদ প্রুস্ত ওয়েল্‌স সিন্‌ক্লেয়ার বা হেলেন কেলার
খাণ্ডবদাহনে পুড়ছে সব, পুড়ে যাচ্ছে সমস্ত মনন
এক-একটা অক্ষর জুড়ে পুড়ে যাচ্ছে এক-এক শতক।
তখন
গোলন্দাজরাই ছিল উলকিপরা এই মশালধারী, আমিই ছিলাম বই,
আর তোমরা ছিলে সেই যারা
ঘুমের মধ্যে অচেতন।

রাত্রি তখন স্রোতস্বিনী। কোলের কাছে তীরবেঁধা হাঁস।
শাদা বুক থেকে শেষ রক্তবিন্দু হাতের পাতায় মেখে নিয়ে তিনি বললেন :
তারও পরে
জন্ম নিই আমি, জন্ম নিতে থাকি,
এ-জন্মের কথা আমি অন্য কোনো জন্মে বলে যাব।

দ

তোমার উদাসীনতায় প্রতিহত হতে হতে
যখন ধ্বংস করতে থাকি চারপাশ
আর তার এক-একটা পিণ্ডের মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে
গড়াতে থাকি দিগ্‌বিদিকে
ঠিক তখনই
আমারই এক টুকরোর সামনে এসে দাঁড়ায় অনাথ একদঙ্গল শিশু
তাদের কেউ-বা চোখে দেখতে পায় না
কারো হাতের আঙুলগুলি বাঁকা
কোনো মুখ-বা ধ্বনিহীন
খোঁড়া পায়ে ঘুঙুরের শব্দ তুলে তারা এগিয়ে আসে আমার দিকে
আর দেখায় কতটা তারা শিখেছে এই প্রতিবন্ধী স্কুলে
ত্রিভঙ্গ শরীর দিয়ে আরতি করতে করতে
চকখড়ি দিয়ে আমার বুকের উপর তারা লিখে দেয় এক
একাক্ষর শব্দ : দ।

সেই মুহূর্তে ভেঙে পড়ে বাজ
সেই মুহূর্তে ঘূর্ণিত হতে থাকে সমস্ত পৃথিবী
সেই মুহূর্তে ঘুঙুরের শব্দ তুলে নেচে ওঠে একাক্ষর দ
আমার বুকের উপর নেচে ওঠে যেন ওই তিনজোড়া পা
দ– দ– দ–
দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্, দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্
শব্দ হয়ে যায় শিশু, শিশুরাও শব্দ হয়ে যায় :
দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্।

তুমি?
তুমি কি দিয়েছ কিছু? কাউকে কি দিয়েছ কখনো?

দেশান্তর

তার পর, সমস্ত পথ একটাও কোনো কথা না বলে
আমরা হাঁটতে থাকি, হেঁটে যেতে থাকি
এক দেশ থেকে অন্য দেশে
এক ধর্ষণের থেকে আরো এক ধর্ষণের দিকে।

পৃথিবী তো এ-রকমই।
এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে, ভাবি।
বটের ঝুরির মতো আমাদের– আমার– শরীর ঘিরে
কত কত অভিজ্ঞতা নেমে এল
সম্বলবিহীন। ইতিহাসহীন।

তার পর, ভোরের সামান্য আগে
সীমান্তসান্ত্রির গুলি বুকে এসে লাগে–
মরণের আগে ঠিক বুঝতেও পারি না আমি শরীর লুটাব কোন্ দেশে।

যেদিন

যেদিন নদীর জলে ভেসেছিল দু-হাজার শব
যেদিন পাড়ার সব দুয়োরে কুলুপ আঁটা ছিল
যেদিন শহরজোড়া গাছে গাছে ঝোলা কাটা হাত
অসাড় ইশারাভরে ডেকেছিল হৃৎপিণ্ডগুলি
যেদিন মাটির থেকে উঠেছিল শুধু কচি হাড়
বুভুক্ষু সমস্ত মুখ ভরে দিয়েছিল হুতাশনে
রাজপথে ছুটেছিল যেদিন উলঙ্গ নারীদল
এবং স্তনের শীর্ষে গাঁথা ছিল হাজার ত্রিশূল
যেদিন কবন্ধগুলি মদভাণ্ড রেখে ডানপাশে
নিজেরই মুণ্ডের চোখ খুঁজেছিল টেবিলের নীচে
যেদিন পৃথিবী তার সম্বিৎ হারিয়ে ছিল চুপ
ঝর্ঝর ঝরার শব্দে ঝরে পড়েছিল সব ধী
মুখেরা ফসিল আর যেদিন ফসিলই হলো মুখ
সেদিনও কি জানতে চাও তাহলে কবির ধর্ম কী?

দায়

যতদূর দেখা যায় সারি সারি সেলাইকরা মানুষ
স্থির দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য।
সে অবশ্য এখন একটু ব্যস্ত, তার অনেকরকম দায়।
পৃথিবীটা একটুখানি ঠিকঠাক করে দেবার দায়
তোমার বসতবাড়িতে ঘুঘু চরাবার দায়
তোমার সবটুকু নিশ্বাস শুষে নেবার দায়
তোমার মুখে রক্ত তুলে দিয়ে সে-রক্ত আবার মুছে নেবার দায়
আর, সত্যি বলতে কী,
তার নিজের গোর খুঁড়বারও দায়।

ক্রমমুক্তি? এভাবেই হবে।
সারি সারি সেলাইকরা মানুষ
প্রতীক্ষায় আছে।

কাগজ

প্রতিদিন ভোরের কাগজে
বর্বরতা শব্দ তার সনাতন অভিধার নিত্যনব প্রসারণ খোঁজে।

কবি

আমারই জন্য কথা বলতে যে
সেকথা কখনো বুঝিনি আমি–
কেননা আমি যে কোন্ আমি, সেটা
এ পাকচক্রে গুলিয়ে গেছে।
দিন আনি আর দিন খাই, তাই
আগামীর কথা ভাবি না কিছু
হাতে তুলে নিই সেটুকু তন্ত্র
হাটেবাজারে যা নিত্য বেচে।

তুমি ভেঙে গেছ তত্ত্বকাঠামো
দাখিল করেছ স্বাধীন মতি
সংশয়ে শুধু প্রশ্ন করেছ
হাজারো নালিশ করেছ দায়ের,
গঞ্জে বা গাঁয়ে ডাইনে বা বাঁয়ে
একা-য় অথবা নানা সমবায়ে
চেয়েছ হরেক মানুষকে ছুঁতে
দ্বন্দ্ব খুঁজেছ হাঁ-এর না-এর।

আমি কি তোমার দৃষ্টি চেয়েছি?
চেয়েছি কি কোনো জীবনছবি?
তোমার কাছে যা চেয়েছি সে শুধু
হও স্লোগানের জোগানদাতা।
তা যদি না হও আমিও নাচার
কোনো পথ নেই তোমার বাঁচার–
তাকে আজ আর কীভাবে নামাব
ঘাড়ে চেপে আছে যে-মান্ধাতা।

সেতু

অনেকদিন তেমন কোনো কথাও বলছি না
কেন তা তুমি ভালোই জানো। অতিথি সৎকারে
কথারা বড়ো ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া তোমারও তো
ছিল নিপাট নির্দয়তা– মুখফেরানো ব্রত।

অনেকদিন তুমি তোমার গোপন সংসারে
ডাক দাওনি সাহস করে, ছিলাম দিশেহারা।
চকঝমকে ঝলসানো মন ভুলেও গিয়েছিল
বেঁচে যখন ছিলাম আমার সঙ্গী ছিল কারা।

তাকাও না আর চোখের দিকে, আমিও চাই না।
না-তাকাবার অজুহাত তো আছেও হাজার হাজার।
একটা কথাই ঘুরতে থাকে অন্দরে-কন্দরে
তোমার আমার মধ্যে এখন সেতু কেবল বাজার।

দোষ

দোষী খুঁজতে খুঁজতে এতদূর আসা গেল।
সবাই সবাইকে পরখ করে দেখছে
এ না ও।
ধরা যে শেষ পর্যন্ত যাবে না তাও অবশ্য জানতাম।
এদিকে, ভিতরে তাকিয়ে দেখি
ঘর আলো করে বসে আছে চামুণ্ডা
তার দুকষ বেয়ে গড়িয়ে নামছে অবিরল
পানের পিক।

খেলা

যারা আমাকে অপমান করেছে
যারা আমাকে ভুল বুঝেছে
এমনকী যারা আমাকে ভুল বুঝিয়েছে
সবাই আজ একসঙ্গে এসে বসেছে গ্যালারিতে
কোন্ খেলা এবার খেলব তারা দেখবে।
কিন্তু
মাঠের ঠিক মাঝখানে
হঠাৎ আমার খুব ঘুম পেয়ে যায়
রেফারির বাঁশিবাজানো আর ওদের হো হো শব্দের মধ্য দিয়ে
যেন একটা সরু নদীর ওপর
হালকা হয়ে ভাসতে থাকে আমার শরীর।

আরো কয়েক পা

দিন চলে যায় ভয়ের জঠরে, জন্মায় তার থেকে
আরো এক দিন– পঙ্গু, আতুর– ভয় ছাড়া তার আর
কেউ নেই কিছু নেই কোনোখানে– বুকে হেঁটে যায় দিন–
এ-রকমই এক পথের দুধারে দুচোখ অন্তরিন।

শতাব্দী পায় উপঢৌকন কাটামুণ্ডের লাফ
আর সে-মুণ্ড যার কোলে পড়ে সে-মাথাও যায় খসে
কবন্ধসারি এড়িয়ে পেরিয়ে বুকে হেঁটে যায় দিন
মনে হয় যেন বেঁচে আছি শুধু বেঁচে থাকবার দোষে।

তারই মাঝখানে যদি বলি এসো হাত রাখো ভালোবাসো
আরো কয়েক পা সামনে যাবার স্বপ্ন দেখেছি কাল–
ফুৎকারে দাও উড়িয়ে সেসব, তোমার সে-উপহাসও
গাঁথা হয়ে যায় স্থিতির ভিতরে, স্মৃতি আজ উত্তাল।

বুকে হেঁটে যায় দিন আর তার শিয়রে চলেছি আমি
ভুল হয় যদি তবু বলি আজও– মাপ করো গোস্তাকি–
প্রতিটি লহমা উপড়ে নিচ্ছে সব পথ, তবু জেনো
স্বপ্নের থেকে স্বপ্নকে নিলে স্বপ্নই থাকে বাকি।

আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি

আমাদের ডান পাশে ধ্বস
আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ
আমাদের মাথায় বোমারু
পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ
আমাদের পথ নেই কোনো
আমাদের ঘর গেছে উড়ে
আমাদের শিশুদের শব
ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।
আমরাও তবে এইভাবে
এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?
আমাদের পথ নেই আর
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

আমাদের ইতিহাস নেই
অথবা এমনই ইতিহাস
আমাদের চোখমুখ ঢাকা
আমরা ভিখারি বারোমাস
পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে
আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

অবিনাশ

অমা এ রাতের মাঝখানে এক সরুপথ
আঁকাবাঁকা হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে বহুদূর
ক্ষতের চিহ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠিক সেখানেই
খুঁজতে গিয়েছি তোমাকে, তোমার অশরীর

গাছপালাঘেরা নির্জনে কোনো সাড়া নেই
নিজেরই কেবল প্রশ্বাসটুকু শোনা যায়
ঘুমের ভিতরে সম্মোহিতের পদপাত
খুঁজতে গিয়েছে তোমাকে, তোমার অবকাশ

মনে পড়ে শুধু ফেলে আসা যত অপঘাত
কীভাবে এখনও গোপন দুর্গ ভেঙে দেয়
কীভাবে এখনও রক্তপাতের ইশারায়
মনে পড়ে শুধু তোমাকেই, তুমি অবিরাম

আমারও দুহাতে দিতে চেয়েছিলে শত দায়
সে-আমি এখানে এতদূরে এসে দেখি আজ
শব হয়ে পাশে শুয়ে আছে যত বনচর
কাঠের শরীরে, তুমি অশরীর, অমলিন

ফিরে আসবার পথে পা বাড়াই, ওঠে ঝড়
নিমেষে নিরালা শব্দে শব্দে ভরে যায়
তড়িৎ চমকে দেখি সব গাছই শমীগাছ
আড়মোড়া ভাঙে শুয়ে ছিল যারা এতকাল

তখনই তোমাকে দেখি আজও তুমি অবিনাশ

যাবার সময়ে বলেছিলেন

অন্ত নিয়ে এতটা ভেবো না
মৃত্যুপথে যেতে দাও মানুষের মতো মর্যাদায়– শুধু
তোমরা সকলে ভালো থেকো।
কিন্তু কাকে বলে ভালো থাকা? জানো?
কতদিন তোমাকে বলেছি স্বর উঁচু করে কথা বলো আবেগে ভাসিয়ে দাও দেশ
ভিখারি মনের এই দেশ
পাহাড়ের চুড়ো থেকে সাগরের কিনারা অবধি
ফেটে যাওয়া খেত যত অগম জঙ্গল আর মজে যাওয়া নদী
ভেসে যাক সেই স্বরে। অবসাদে ঘেরা
নষ্ট হয়ে আছে সবুজেরা
কে তাকে ফেরাবে আর তোমরা যদি কিছু না-ই বলো?
যেদিকেই যাও শুধু প্রাচীনের ভস্ম ঝরে পড়ে
মাথার উপরে
বন্ধ হয়ে আসে সব চোখ
ভুলে গেছি কে দেয় কে দিতে পারে কেই-বা প্রাপক
এই মহা ক্রান্তিকালে।
ক্রান্তিকাল? তোমরাও কি ভাবো ক্রান্তিকাল?
তোমাদের জীবনমুদ্রায় কোনো চিহ্ন নেই তার।
কেন? কেন নেই?
এসো এই মুমূর্ষুর বুকে রাখো হাত
এর ক্ষীণ রক্ত থেকে তোমার রক্তের দিকে বয়ে যাক দাহ
ঘটুক সংঘাত
দেখো তার মধ্য থেকে ভিন্ন কিছু জেগে ওঠে কি না।
অন্ত নিয়ে এতটা ভেবো না
রাখো এ প্রবাহ
শেষ বিশ্বাসের সামনে কথা দাও তুমি দেশ তুমিই এ প্রসারিত দেশ
তোমারই স্নায়ুর মধ্যে বহমান কাল–
যাবার মুহূর্তে আমি আজ শুধু নিয়ে যাব এইটুকু রক্তিম প্রবাল।

‘তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে’

তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে
এ-রকমই দিন থাকবে না চিরদিন
তা শুনে কত-না ধামাকায় মেতে গিয়ে
কী আশ্চর্য নেচেছি অন্তহীন।

উৎসবে ভরা উৎকট দেখে দেখে
স্বাভাবিককেই ভেবেছি বিসদৃশ।
অকুণ্ঠ মনে– তুমি হাতে তুলে দিলে–
পান করে গেছি যে-কোনো তীব্র বিষও।

তুমি বলেছিলে দল হবে দল হবে
দলের বাইরে থাকবে না কিছু আর
অনুগত হলে সহজে পেরিয়ে যাবে
দুর্গম গিরি দুস্তর পারাবার।

ঝুরে ঝুরে পড়ে ভূমণ্ডলের মাটি
আমরা যে-কোনো গর্তের মুখে বাঁচি
বন্ধ্যবিষাদ ভরে আছে বুকে বুকে
আসিনি তবুও কেউ কারো কাছাকাছি।

তুমি বলেছিলে যার হবে তার হবে
তোমারই মোহরে চলমান সংসার–
এই অবেলায় কখনো ভাবিনি আগে
জয়ের ভিতরে এত দুর্বার হার!

একটি গাথা

ঘুম ছুটে যায়, গ্রাস ওঠে না মুখে
রাস্তা জুড়ে স্পন্দ জাগায় পা
চলছি ওদের সামনে যাব বলে
আমরা সবাই মনোরমার মা
কিছুই এখন নেই হারাবার আর
আমরা সবাই উলঙ্গিনী আজ
মশাল হয়ে উড়ছে কেবল চুল
এই আমাদের শেষের রণসাজ
আসছি ছুটে সমস্ত দিক থেকে
উজাড় শহর বাজার উজাড় গাঁ
আমরা সবাই মনোরমার মা
সবাই আমরা মনোরমার মা

ওইখানে ওই প্রকাণ্ড রৌরবে
ডাক দিয়েছে আমার মেয়ের হাড়
যাক উড়ে যাক অঙ্গবসন যাক
এবার থেকে মানছি না আর হার
যাক পুড়ে যাক হল্‌কা লেগে ছাই
যাদের ওপর পড়ছে এ নিশ্বাস
স্পষ্ট তারা চক্ষু খুলে রাখ্‌
দেখ্‌ রে চেয়ে লক্ষ ঈডিপাস
তারপরে যা অন্ধ হয়ে যা
এই চলা আর কোথাও থামার না
আমরা সবাই মনোরমার মা
সবাই আমরা মনোরমার মা

খাড়াই পথে খাদের খাঁজে খাঁজে
লুটোয় কেবল খুবলে খাওয়া শরীর
এই পৃথিবী ঘুরছে তবু রোজই
টিক টিক টিক ঘুরছে কাঁটা ঘড়ির
ঘুরুক, তবু আসবি কে আর আয়
আয় আমাদের সবাইকে ধর্‌ ঘিরে

ভয় নেই তোর লজ্জারও লেশ নেই
চিনবে না কেউ লক্ষ লোকের ভিড়ে
আয় আমাদের শরীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে
রক্তমাংস যা পাস সবই খা
তবু আমরা মনোরমার মা
আমরা তবু মনোরমার মা

চলছি সবাই মনোরমার মা
সবাই আমরা মনোরমার মা

বদল

এখন আর আমাদের কোনো অশান্তি নেই
কেননা আমরা দল বদল করেছি
হয়ে গেছি ওরা।
সেদিন সারারাত জুড়ে চলছিল সেই বদলের উৎসব
পালটে যাচ্ছিল ধ্বজা
থমথমে উল্লাসে ভরে যাচ্ছিল প্রাঙ্গণ
আর গান আর হুল্লোড় আর জয়ধ্বনি আসছিল ভেসে
আর ভোজের সুবাস।
কোনো অশান্তি ছিল না আর, কেবল
আগুনের হল্‌কার পাশে
তখনও তোমার মুখে গতজন্মের ছায়া দুলতে দেখে
তোমাকে নিঃশব্দ দেখে
আমরা এগিয়ে এসে বলেছি : ভয় কী,
এই তো ভালো হলো
আমরা এখন হয়ে গেছি ওরা
আর কোনো অশান্তি রইল না আমাদের
দেখো কেমন চমৎকার কেটে যাচ্ছে আমাদের কৃমিকীট জীবন।

মন্দ

ভিতর থেকেই ভালোবাসব ভেবে
গিয়েছিলাম সেদিন তোমার কাছে
কিন্তু এ কী আরেকরকম মুখ
জেগে উঠল দহনবেলার আঁচে।

শরীরমনকে জরিপ করে নিয়ে
চাইছিলে সব সন্দেহভঞ্জন
আলতো টানে চোখের সীমানাতে
হিংস্রতাকে করছিলে অঞ্জন

দিন বা রাতে গলিতে রাজপথে
ঝুলিয়ে দিয়ে রক্তঝরা ঝালর
দেখছিলে ঠিক কাদের হিসেবমতো
তফাত করি মন্দ এবং ভালোর

বাঁধছিলে খুব শক্ত আলিঙ্গনে
না হই যাতে পিছলপথগামী
সবটা যদি তোমার মতো না হই
অবশ্যই মন্দ তবে আমি–

মন্দ তবে অবশ্যই আমি।

হাসপাতালের সামনে একটা পাগল

হাসপাতালের সামনে একটা পাগল
রাত্রিবেলার প্রার্থনা করছিল
দিনের যত হল্লা আমার মাথায়
তখনও তার সামান্য ঘোর ছিল
ভাবছি যে তাই ভুল শুনলাম না কি
ওর কথাটার শেষ কিছুটা বাকি

বিড়বিড়িয়ে বলছিল 'ও পাথর
এই বাড়িটার সবাই যেন বাঁচে!'
শুনশান সব পথঘাট চারদিকে
ঈশ্বরও কেউ ছিল না তার কাছে
জপের শেষে পথ পেরোতে গিয়ে
উল্‌টে গেল উল্‌কামুখী বাসে
হাসপাতালের সামনে একটা পাগল
মরে রইল নিজেরই অভ্যাসে!

বিভূতি

করেছ তো জানি অনেক কিছুই
পেয়েছও সেইমতো
ভাবোনি কখনো কোন্ দেশগাঁয়ে
কারা হলো বিক্ষত!

সব তৃষ্ণার জল শুষে নিয়ে
পেয়েছ আপন জল
সকলেরই কাছে সেকথা এখন
নিতান্ত প্রাঞ্জল।

উঁচু থেকে আরো উঁচুতে তুলেছ
শুধু ঝলমলে চুড়ো
খিলানে খিলানে শ্বাস রেখে যায়
কত ছেলে কত বুড়ো!

তুমি কি কেবলই নষ্ট ফসল?
কেবলই কি আততায়ী?
এবারে তোমার নিজেরই কীর্তি
ভাঙার সাহস চাই।

জনাদর যদি ভুলে যেতে পারো
ছেড়ে দিতে কিসে ভয়?
তোমার জপের কেন্দ্র তো শুধু
ক্ষমতাশীর্ষ নয়!

খবর

আধখোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে খবর
জানলার কোনায় কোনায় টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে খবর
এদিকওদিক সরে যাচ্ছি কিন্তু কেবলই আমাকে চেপে ধরছে খবর
দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসি বাইরে
দৌড়োতে থাকি প্রাণপণ
কিন্তু আমার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে খবর, খবরের ঘূর্ণি
উপুড় হয়ে পড়ে যাই পথে
আমার ওপর স্তূপ হয়ে জমতে থাকে খবর
বন্ধ হয়ে আসে নিশ্বাস
আমার মৃত শরীরের ওপর আহ্লাদে নাচতে থাকে
নাচতেই থাকে শুধু জলজ্যান্ত খবরের পর খবরের পর খবর

যা ঘটবার ঘটতে থাকে

আমরা কথা বলি
আমরা কথা বলি আর প্রতিবাদ করি
প্রতিবাদ করতে করতে কথা বলি
কথা বলতে বলতে প্রতিবাদ করি
আর যা ঘটবার তা ঘটতে থাকে
আর আমাদের প্রতিবাদগুলি তাকে ঘিরে খেলা করে
রং ছোঁড়ে, নাচে
আর ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে
আর আমাদের প্রতিবাদগুলি খেলা করে
আমরা গুমরোই, গান গাই
আমরা কথা বলি, পিঁপড়ে হয়ে এগোই
যা ঘটবার তা ঘটতে থাকে
আমরা প্রতিবাদ করি
করতে করতে ঘুমোই
ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলি
যা ঘটবার ঘটতে থাকে
ঘটতে থাকে

শবসাধনা

বুঝি তোমার চাউনি বুঝি
থাকবে না আর গলিঘুঁজি
থাকবে না আর ছাউনি আমার কোথাও
ও প্রোমোটার, ও প্রোমোটার
তোমার হাতে সব ক্ষমতার
দিচ্ছি চাবি, ওঠাও আমায় ওঠাও।

তুমিই চিরনমস্য, তাই
তোমার পায়ে রত্ন জোটাই
তোমার পায়েই বিলিয়ে দিই শরীর—
যাঁর যা খুশি করুন তিনি
করবে তুমি কল্লোলিনী
ভরসা কেবল কলসি এবং দড়ির।

আমার বলে রইল শুধু
বুকের মধ্যে মস্ত ধু ধু
দিয়েছি সব যেটুক ছিল দেবার
ঘর ছেড়ে আজ বাইরে আসি
আমরা কজন অন্তেবাসী
শবসাধনায় রাত কাটাব এবার।

বাজার

ভেবেছিলাম সঙ্গ পাব একটা কোনো বেলা
গলির মুখে একলা দুহাত মিলবে এসে হাতে
এক লহমার চোখের চাওয়ায় ভাসিয়ে নেবে আমায়
টান দেবে কোন্ দশ লহরের গঙ্গাযমুনাতে।

বাইরে এলে চোখ পুড়ে যায়, এদিকওদিক জুড়ে
বিশ্বলোকের চর্‌কি ঘোরায় যাকিছু জমকালো
যেদিকে চাই সমস্তটাই উৎসবে-ঝংকারে
রূপের উপর রূপ ঢেলে দেয়, আলোর উপর আলো।

ঝলসানো সেই আলোয় দেখি তুমি কোথাও নেই
চিহ্ন কেবল ছড়িয়ে আছে আদ্যোপান্ত সাজার–
গমক ধুলো কাপাসতুলো হাড়কাঁকরের পাশে
আমি শয়ান পথে আমার বুকের উপর বাজার।

ধুলো

হাতে তার ছিল না কিছুই
তবু সে এসেছে এতদূর
শুধু অবিরাম অপঘাতে
অধোমুখ হয়েছে বিধুর।

এখন শুয়েছে ধুলো মেখে
পাড়ের ঢালুর কাছে এসে
ভুলে গেছে সব প্রতিবেশ
ভুলে গেছে কোথায় সে, কে সে।

মুছে গেছে যত প্রিয় গান
আকুল শ্রবণস্মৃতি থেকে
চোখে আজ সব নিরাকার
ইশারাবিহীন অভিলেখে।

মিলের ভিতরে ঢেকে রাখা
কত না অমিল অধিকার
দুহাত বাড়িয়ে দেখেছে সে
আজ কেউ কাছে নেই তার।

বিদায়ফলক

সবকটা তার শব্দ এখন ছড়িয়ে থাকা নুড়ি
হা হা করে উড়ছে কেবল বালি
ঘুমের মধ্যে হাত বাড়ানো, কিচ্ছু কোথাও নেই
সমস্ত ঘর খালি।

বাতাস থেকে ঝরে পড়ছে একটি-দুটি চড়ুই
শুকোচ্ছে সব সঙ্গহারা প্রাণ
কেউ জানে না কোন্‌খানে কোন্ ছোট্ট একটা থাবায়
সমস্ত দিন হয়েছে খান্ খান্!

কষ্ট

তুমি বলে গেলে : তোমাতে আমার কোনো মন নেই আর।
মৃৎনির্মাণের মতো বসে আছি।
সামনে দিঘির জল সে-রকমই টলটল করে
সে-রকমই হাওয়া বয়ে যায়।
আর কোনো চিহ্ন পড়ে নেই
আমারও মনের মধ্যে কোনো নীল রেখাপাত নেই। শুধু
তোমার কথাতে কোনো কষ্টের আঘাত পাইনি দেখে
অবিরাম কষ্ট হতে থাকে।

এত ছোটো হাত

'nobody, not even the rain, has such small hands'—Cummings

আবহাওয়া ছিল খানিকটা ভারী কিছুটা ভিজে
আমিও ছিলাম মন্থর ওই মেঘের মতো
শুনেছি এখনও যাওয়া-আসা করো, দেখিনি নিজে

দু-একটি শুধু স্বর ভেসে আছে ইতস্তত।
অথচ সেদিন ঝরে গেছে পাশে কত প্রপাত
বারে বারে কত হারিয়ে ফেলেছি কথার খেই
বলেছি কেবল হাতে তুলে নিয়ে ও-দুটো হাত
বৃষ্টিরও নেই এত ছোটো হাত কারোই নেই!

এ যদি না হয় আবহমানের অস্তিভার
তবে কাকে বলে সত্যি? বলো তো কাকে বলি?
শুনেছি এখনও যাওয়া-আসা করো, কিন্তু তার
পরিণাম নেই, কথার উপরে জমে পলি।
সেই ছুঁয়ে থাকা সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক
সরে যেতে যেতে মুছে যায় কবে অলক্ষ্যেই
জেগে থাকে মনে একটাই শুধু অমোঘ শ্লোক
বৃষ্টিরও নেই এত ছোটো হাত কারোই নেই!

পালক

সবকিছু মুছে নেওয়া এই রাত্রি তোমার সমান
সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি পড়ে। কখনো কখনো
কাছে দূরে জ্বরে ওঠে ফসফরাস। কিছুরই কোথাও
ক্ষান্তি নেই। প্রবাহ চলেছে শুধু তোমারই মতন
একা একা, তোমারই মতন এত বিকারবিহীন।
যখনই তোমার কথা ভাবি তবু, সমস্ত আঘাত
পালকের মতো এসে বুকের উপরে হাত রাখে
যদিও জানি যে তুমি কোনোদিনই চাওনি আমাকে।

—

অনুক্রম

দিনগুলি রাতগুলি (রচনা ১৯৪৯-৫৫। প্রকাশ ১৯৫৬) ৯-২৪
দিনগুলি রাতগুলি ৯ বাউল ১২ কবর ১৩ ঘরেবাইরে ১৫ সপ্তর্ষি ১৬ বলো তারে, 'শান্তি শান্তি' ১৮ যমুনাবতী ২০ সূর্যমুখী ২১ অন্যরাত ২২ পথ ২৩ আড়ালে ২৩ কলহপর ২৪

নিহিত পাতালছায়া (রচনা ১৯৬০-৬৬। প্রকাশ ১৯৬৭) ২৫-৪৮
বিপুলা পৃথিবী ২৫ সত্তা ২৬ মাতাল ২৬ অন্তিম ২৬ পাগল ২৭ বুড়িরা জটলা করে ২৮ পোকা ২৮ প্রতিশ্রুতি ২৯ কিউ ৩০ বাস্তু ৩০ ভিড় ৩১ রাস্তা ৩১ অলস জল ৩২ ফুলবাজার ৩২ পিঁপড়ে ৩৩ সঙ্ঘ ৩৪ মিলন ৩৪ জল ৩৫ ইট ৩৫ বাড়ি ৩৫ ঘর : ১ ৩৬ ঘর : ২ ৩৬ মধ্যরাত ৩৭ বৃষ্টি ৩৭ মুনিয়া ৩৮ রাঙামামিমার গৃহত্যাগ ৩৮ মধ্যদুপুর ৩৮ হাজারদুয়ারি ৩৯ ছুটি ৩৯ ভাষা ৪০ সময় ৪১ ভিক্ষা ৪১ নাম ৪১ এম্‌নি ভাষা ৪২ সহজ ৪২ প্রতীক্ষা ৪৩ প্রতিহিংসা ৪৩ গুল্ম, ঈথার ৪৩ দ্বা সুপর্ণা ৪৪ চরিত্র ৪৪ যখন প্রহর শান্ত ৪৫ চাবি ৪৫ আড়াল ৪৫ দেহ ৪৬ জন্মদিন ৪৬ নষ্ট ৪৭ উদাসীনা ৪৭ সুন্দর ৪৮

তুমি তো তেমন গৌরী নও (রচনা ১৯৬৭-৬৯। প্রকাশ ১৯৭৮) ৪৮-৬২
এই নদী, একা ৪৮ শুশুনিয়া ৪৯ মিথ্যে ৫০ অশুচি ৫০ ভিখারি বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও ৫১ দশমী ৫১ পুনর্বাসন ৫২ ভূমধ্যসাগর ৫৪ আরুণি উদ্দালক ৫৬ জাবাল সত্যকাম ৫৯

আদিম লতাগুল্মময় (রচনা ১৯৭০-৭১। প্রকাশ ১৯৭২) ৬৩-৭৪
পাথর ৬৩ অবিমৃশ্য বালি ৬৩ বিষ ৬৪ পুতুলনাচ ৬৪ দল ৬৫ ক্রমাগত ৬৬ বিকেলবেলা ৬৬ নিগ্রো বন্ধুকে চিঠি ৬৭ কলকাতা ৬৭ বোকা ৬৮ সত্য ৬৯ চিতা ৬৯ বিরলতা ৭০ বৃষ্টিধারা ৭০ যৌবন ৭১ ত্যাগ ৭১ প্রেমিক ৭২ ঠাকুরদার মঠ ৭২ অঞ্জলি ৭৩ রেড রোড ৭৩

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় (রচনা ১৯৭২-৭৩। প্রকাশ ১৯৭৪) ৭৪-৯০
নির্বাসন ৭৪ শরীর ৭৫ খরা ৭৫ না ৭৬ বর্ম ৭৬ স্পর্ধা ৭৭ সন্ততি ৭৭ প্রতিভা ৭৮ শাদাকালো ৭৯ হাসপাতাল ৭৯ পায়ের নীচে একটুকরো খাবার ৭৯ বাবুমশাই ৮১ পাগল হবার আগে ৮৩ এই শহরের রাখাল ৮৪ ঘরে ফেরার

রাত ৮৪ তিমির বিষয়ে দু-টুকরো ৮৫ বড়ো বেশি দেখা হলো ৮৬ তুমি ৮৬ গঙ্গাযমুনা ৮৬ মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় ৮৭ হওয়া ৮৮ বাজি ৮৮ ধর্ম ৮৯ সঙ্গিনী ৮৯ মানে ৯০

বাবরের প্রার্থনা (রচনা ১৯৭৪-৭৬। প্রকাশ ১৯৭৬) ৯১-১০৪

ধ্বংস করো ধ্বজা ৯১ পুরোনো গাছের গুঁড়ি ৯১ সেদিন অনন্ত মধ্যরাত ৯২ মণিকর্ণিকা ৯৩ জীবনবন্দী ৯৪ তক্ষক ৯৪ বাবরের প্রার্থনা ৯৫ শূন্যের ভিতরে ঢেউ ৯৬ মনকে বলো 'না' ৯৭ কিছু-না থেকে কিছু ছেলে ৯৭ হাসপাতালে বলির বাজনা ৯৮ চাপ সৃষ্টি করুন ৯৮ 'মার্চিং সং' ৯৯ ধাঁধাচূড়া ১০০ 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' ১০১ বিকল্প ১০১ হাতেমতাই ১০২ মনোহরপুকুর ১০৩ নচিকেতা ১০৩

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ (রচনা ১৯৭৬-৭৮। প্রকাশ ১৯৮০) ১০৪-১১০

অর্কেস্ট্রা ১০৪ পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ ১০৪

প্রহরজোড়া ত্রিতাল (রচনা ১৯৭৭-৮১। প্রকাশ ১৯৮২) ১১০-১১৯

ত্রিতাল ১১০ বৈরাগীতলা ১১১ উলটোরথ ১১১ অন্ধ ১১২ ভয় ১১৩ জ্যাম ১১৪ শ্লোক ১১৪ দশক ১১৫ পিকনিক ১১৬ ভাষা ১১৭ আত্মঘাত ১১৭ দাবি ১১৮ ভাস্কর ১১৯ শিলালিপি ১১৯

বন্ধুরা মাতি তরজায় (রচনা ১৯৭৬-৮০। প্রকাশ ১৯৮৪) ১২০-১২১

অগস্ত্যযাত্রা ১২০ সকলের গান ১২০

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে (রচনা ১৯৮২-৮৩। প্রকাশ ১৯৮৪) ১২১-১৩৭

আমাদের শেষ কথাগুলি ১২১ যদি ১২২ চড়ুইটি কীভাবে মরেছিল ১২৩ কোবালম বীচ ১২৪ হেতালের লাঠি ১২৫ মন্ত্রীমশাই ১২৬ লজ্জা ১২৭ দেশ আমাদের আজও কোনো ১২৮ আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব ১২৯ ভিখিরির আবার পছন্দ ১৩৩ কাব্যতত্ত্ব ১৩৩ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে ১৩৪ জন্মদিন ১৩৫ মেঘের মতো মানুষ ১৩৬ বোধ ১৩৬ পদ্মসম্ভব ১৩৭

ধুম লেগেছে হৃৎকমলে (রচনা ১৯৮৪-৮৬। প্রকাশ ১৯৮৭) ১৩৭-১৫০

ক্যান্সার হাসপাতাল ১৩৭ স্বপ্ন ১৩৮ পোশাক ১৩৯ হৃৎকমল ১৩৯ শেকল বাঁধার গান ১৪০ মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায় ১৪১ খবর সাতাশে জুলাই ১৪২ অন্ধবিলাপ ১৪৩ শিশুরাও জেনে গেছে ১৪৬ যন্ত্রের এপার থেকে ১৪৭

ভালোবাসা অর্ধেক স্থপতি ১৪৮ তাই এত শুকনো হয়ে আছে ১৪৮ টলমল পাহাড় ১৪৯ সৈকত ১৫০

লাইনেই ছিলাম বাবা (রচনা ১৯৯০-৯৩। প্রকাশ ১৯৯৩) ১৫০-১৫৪
স্তব ১৫০ মত ১৫১ চরিত্র ১৫১ লাইন ১৫২ বোঝা ১৫২ বেলেঘাটার গলি ১৫৩ ন্যায়-অন্যায় জানিনে ১৫৩ তুমি কোন্ দলে ১৫৪

গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ (রচনা ১৯৮৭-৯৪। প্রকাশ ১৯৯৪) ১৫৪-১৬৩

শবের উপরে শামিয়ানা (রচনা। ১৯৯৪-৯৬। প্রকাশ ১৯৯৭) ১৬৩-১৭২
গ্রহণ ১৬৩ আমার মেয়েরা ১৬৪ থাকা ১৬৪ অবলীন ১৬৪ বিশ্বাস ১৬৫ মেঘ ১৬৫ পরিখা ১৬৬ ছেলেধরা বুড়ো ১৬৬ ঘাতক ১৬৭ জলেভাসা খড়কুটো : প্রথম গুচ্ছ ১৬৮ জলেভাসা খড়কুটো : দ্বিতীয় গুচ্ছ ১৭০ জলেভাসা খড়কুটো : সপ্তম গুচ্ছ ১৭২

ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার (রচনা ১৯৯৭-৯৮। প্রকাশ ১৯৯৯) ১৭২-১৮২
বিষণ্ণকরণী ১৭২ পক্ষাঘাত ১৭৩ কথার ভিতরে কথা ১৭৪ এখনও সে ১৭৪ মঠ ১৭৫ সন্ধ্যানদীজল ১৭৫ ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার ১৭৬ মহাপরিনির্বাণ ১৭৬ চক্ষুষ্মতী, তার কবিকে ১৭৭ বন্ধুকে বন্ধু ১৭৭ রক্তের দোষ ১৭৮ শিল্পী ১৭৯ অপমান ১৭৯ ঈশ্বরী ১৮০ সবুজ ছড়া ১৮১ শহিদশিখর ১৮১

জলই পাষাণ হয়ে আছে (রচনা ২০০১-০৩। প্রকাশ ২০০৪) ১৮২-১৯১
জলই পাষাণ হয়ে আছে ১৮২ সে অনেক শতাব্দীর কাজ ১৮৩ জাতক ১৮৪ দ ১৮৫ দেশান্তর ১৮৬ যেদিন ১৮৭ দায় ১৮৭ কাগজ ১৮৮ কবি ১৮৮ সেতু ১৮৯ দোষ ১৮৯ খেলা ১৯০ আরো কয়েক পা ১৯০ আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি ১৯১

সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি (রচনা ২০০৪-০৬। প্রকাশ ২০০৭) ১৯২-২০৩
অবিনাশ ১৯২ যাবার সময়ে বলেছিলেন ১৯৩ 'তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে' ১৯৪ একটি গাথা ১৯৫ বদল ১৯৬ মন্দ ১৯৭ হাসপাতালের সামনে একটা পাগল ১৯৭ বিভূতি ১৯৮ খবর ১৯৯ যা ঘটবার ঘটতে থাকে ১৯৯ শবসাধনা ২০০ বাজার ২০০ ধুলো ২০১ বিদায়ফলক ২০২ কষ্ট ২০২ এত ছোটো হাত ২০২ পালক ২০৩